

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

ঈশ্বর গুপ্ত ও বাংলা সাহিত্য

সঞ্জীবকুমার বসু

সংস্কৃতি প্রকাশন। ১০ হেস্টিংস স্ট্রিট। কলিকাতা-১

প্রকাশক : চব্বিশ পরগণা জেলা সংস্কৃতি পরিষদের
পক্ষে শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন
কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম প্রকাশ : অগস্ট ১৯৫৯

মুদ্রক : শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড
৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলিকাতা-৯
প্রচ্ছদপটশিল্পী। শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত
পরিবেশক : দাশগুপ্ত এন্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
৫৪।৩ কলেজ স্ট্রিট। কলিকাতা-১২

উৎসর্গ

মাননীয়

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন

ও

জননায়ক শ্রীঅতুল্য ঘোষ

করকমলে

সূচীপত্র

প্রস্তাবনা

বাংলাদেশ কবির দেশ। বাংলা ভাবুকের দেশ, প্রেমিকের দেশ। বাঙগালীর এই কবি-প্রাণতা, কবি-প্রীতি, ভাবুকতা তথা প্রেমিকতা একদিকে যেমন বাংলার সংস্কৃতিকে সরস করেছে, সুরভিত করেছে, তেমনি অন্যদিকে কিছু কিছু কুফলও প্রসব করেছে। বাঙগালীর এই অতিভাবুকতা বাঙগালীকে করেছে কখনো আত্মবিস্মৃত, কখনো সংস্কৃতি-অনুরাগ-বিচ্যুত।

ঈশ্বর গুপ্তকে জানবার এবং বোঝবার প্রয়াস এদেশে একেবারেই যে না হয়েছে তা নয়, তবে সে প্রচেষ্টা আশানুরূপ ব্যাপক নয়। এর একটা কারণ হয়তো এই যে, ঈশ্বর গুপ্ত ঊনিশ শতকের যে নবীন কবিদলের অংশতঃ পথপ্রদর্শক, অংশতঃ অগ্রজমাত্র, তাঁরাই বাংলা কাব্যের পাঠকরুচি পরিবর্তন করে গেছেন। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের কাল ঈশ্বর গুপ্তের সন্নিহিত ভবিষ্যতে হলেও তাঁদের আদর্শ ছিল অন্যমুখী।

জন্মকালের এবং আয়ুষ্কালের বিচারে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন পূর্বগামী সাধক কবি রামপ্রসাদ সেনের খুবই কাছাকাছি; জন্মস্থান ও প্রতিবেশ-সূত্রে উভয় কবিই চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে সব সাহিত্যরথী বাংলা সাহিত্যের প্রশস্ত প্রাঙগণে তাঁদের 'কলা'-চাতুর্য প্রদর্শন করে পাঠকচিত্তকে আকৃষ্ট করেছেন, গুপ্ত কবির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব

তাঁদের অনেকেরই সাধনায় দেখা যায়। কুশলী স্বর্ণকার যেমন খাঁটি সোনার সঙ্গে কিছু খাদ মিশিয়ে অলঙ্কার গঠন-নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়, সাহিত্যের সেইরকম নিপুণ শিল্পী ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। তাঁর নিজের সৃষ্টিতে কিছু খাদ যে ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর রচনার ঐ খাদ-টুকু তথা কিঞ্চিৎ গ্রাম্যতা, কিঞ্চিৎ অশ্লীলতাকে বাদ দিলে তাঁর সাহিত্যের বাকি অংশ খাঁটি সোনার মতই উজ্জ্বল হয়ে থাকে। তাঁর এই সৃষ্টিকৌশল অন্য একক্ষেত্রে বিশেষ স্ফূর্তি লাভ করেছে—সে হলো কবি নিজে পরবর্তী যুগের বহু সাহিত্যিক-প্রতিভার বিকাশের বন্ধুর পথকে মসৃণ, কোমল ও সহজসুন্দর করেছেন, ছোটবড়ো অনেক সাহিত্যিকের সাধনাকে সার্থকতার পথে চালিত করেছেন, তাঁদের অনুপ্রাণিত করেছেন।

তাই, বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্তের স্থান বিশিষ্ট এবং অর্থবহ।

আজ যে সহর কলকাতা আমাদের বাংলা সাহিত্যের লীলাভূমি,—সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র, একদিন এই শহর-কলকাতার সংস্কৃতি ঈশ্বরগুপ্তীয় ভাবধারায় উদ্ভাসিত ও আন্দোলিত হয়েছে। বাঙ্গালীর সমাজ-জীবনে তখন চলেছে একটা বিশৃঙ্খলা, জাতির জীবনে তখন নানা অসন্তোষের ধূমায়িত-রূপ, ইংরাজ-শাসনের রুদ্রমূর্তি; সাধারণের রুচিবিকার তখন চরমে,—পরানুকরণে পরমুখাপেক্ষিতায় বাঙ্গালীর সর্বাবয়ব ছেয়ে গেছে। ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য ছিল সে যুগের শ্রেষ্ঠ কাব্য। সেকালের সমাজে গুপ্তকবিই শ্রেষ্ঠ সম্মান পেয়েছেন। তিনি কারো কারো মতে যুগের কবি, যুগোত্তীর্ণ নন। কিন্তু যে কারণে তিনি আমাদের হৃদয়ে চিরশ্রদ্ধার আসন রচনা করেছেন, সেটি প্রধানতঃ এই যে তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙ্গালী কবি।

বাংলা ও বাঙগালীর জাতীয় ভাবধারা তাঁর জীবন ও কাব্যের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে। সমাজের দোষত্রুটিকে তিনি ক্ষমা করেননি; পরিহাসের সঙ্গে সমালোচনা করেছেন। কৃত্রিমতার মুখোস খুলে তাকে করতে চেয়েছেন খাঁটি স্বদেশী ও সামাজিক।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র একটি যুগ-সন্ধিক্ষণের কবি। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—'আজিকার দিনের অভিনব এবং উন্নতির পথে সমারূঢ় সৌন্দর্যবিশিষ্ট বাঙ্গালা সাহিত্য দেখিয়া অনেক সময়ে বোধ হয়—হোক সুন্দর, কিন্তু এ বুঝি পরের—আমাদের নহে। খাঁটি বাঙ্গালী কথায়, খাঁটি বাঙ্গালীর মনের ভাব ত খুঁজিয়া পাই না। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এখানে সব খাঁটি বাঙ্গালা। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি—ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালীর কবি। এখন আর খাঁটি বাঙ্গালী কবি জন্মে না, জন্মিবার যো নাই,—জন্মিয়া কাজ নাই।' প্রাচীন যুগের শেষ কবি এবং আধুনিক যুগের প্রথম কবি। সে যুগে প্রতীচ্য সভ্যতার সর্বগ্রাসী আলো যাকে স্পর্শ করলেও ঠিক প্রভাবিত করতে পারেনি; যিনি সেই প্রভাবকে আত্মসাৎ করেও স্বকীয়তায় উজ্জ্বল,—এমনি এক যুগতাৎপর্যময় প্রতিভা, ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন সেই মানুষ। বাংলাসাহিত্যে এমনি আর একজন কবির সাক্ষাৎ পাই যিনি বিশিষ্ট হয়েছেন নিজ প্রতিভার আলোকে, নিজ কাব্য-সাধনার বিকশিত সৌরভে—তিনি হলেন 'স্বভাব-কবি' গোবিন্দদাস। ঈশ্বরচন্দ্র ও গোবিন্দদাস দু'জনে প্রায় সগোত্র। দু'জনই স্বভাব কবি। এঁদের উভয়ের জীবন-দর্শনেও কিছু মিল আছে। ব্যক্তি-জীবনে—পারিবারিক জীবনে, সমাজ-জীবনেও উভয়ের মধ্যে প্রচুর সাধর্ম্য ও মিল খুঁজে পাই।

শুধু জীবনের দুই বিশেষ দিকে দু'জনের কাব্য-স্রোত প্রবাহিত হলেও উৎসস্থল একই। দু'জনেই স্বাদেশিক কবি, দু'জনেই খাঁটি কবি-প্রাণের অধিকারী, দু'জনেই স্বভাব-শিল্পী, সহজেই সরব।

কবিবর ঈশ্বর গুপ্তই একমাত্র কবি যিনি প্রথম পুরাতন ও নতুনের মধ্যে, প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে সেতুবন্ধন করেছেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব তাই বিশেষ তাৎপর্যময়। তিনিই প্রাচীন যুগের সর্বশেষ প্রতিনিধি, আবার নবীনযুগের উন্মেষসাধক—উভয় যুগ-যোজনায় নব প্রজাপতি। সংক্ষেপে বললে, কবিগান, পাঁচালী, আখড়াই, তরজা প্রভৃতি রচনা যখন বাংলাদেশকে মুখর ও সরস করছে তখনই সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাব। কাজেই এই সময়ের এই বিশেষ প্রতিবেশ কবির কবি-প্রতিভাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। কবি নিজেও কবিগানের রচয়িতা ছিলেন, নিজে বহুদিন কবি-সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের আয়ুষ্কাল গেছে ১৮১২ থেকে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ। কিন্তু অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে জন্মগ্রহণ করলেও পূর্ববর্তী কবি-সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক-সূত্র তিনি ছিন্ন করতে পারেননি। আর পারেননি বলেই তাঁদের কাব্য-কৌশলের অঙ্গ-স্বরূপ অলঙ্কার, শব্দাড়ম্বরপ্রিয়তা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও শেষে অশ্লীলতা কবি ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় সংক্রামিত হয়েছিল। তাঁর রচনারীতি বিশেষভাবে ভারতচন্দ্রীয় যুগকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। অতি-আধুনিক কালের পাঠকের চোখে সেকালের ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা যে অমার্জিত, রুক্ষ ও অসংযত মনে হবে, হয়তো সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; কিন্তু এসব সত্ত্বেও কবির দৃষ্টিভঙ্গি ও মননের মধ্যেই রয়েছে আধুনিকতার ছাপ।

সত্যিকার যুগ-প্রতিনিধি যে কবি, তাঁর কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ থাকে। তিনি তাঁর নিজের কালের ভাবনা বেদনার প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। যে যুগে তিনি জন্মেছেন, সে যুগ কতকটা ভাব-চাপল্য ও অসংযমের যুগ। তাই সে যুগের কবি ঈশ্বর গুপ্তের কাছে অতি উৎকৃষ্ট কবি-প্রতিভা বা কাব্য-সৌন্দর্য আশা করা হয়ত তেমন যৌক্তিকও নয়। কিন্তু তবু তাঁর রচনায় আমরা যা পাই, সে যুগের আর কোন কবির মধ্যে তার সন্ধান পাই না। বাস্তব সমাজের রূপায়ণে, লঘু চপল ব্যঙ্গের সরস নিক্ষেপণে, স্বদেশপ্রেমের উদ্বোধনে, বাংলা সাহিত্যে তিনিই ছিলেন সে যুগের কবিদের পথপ্রদর্শক। অতি সাধারণ বিষয় নিয়ে যেমন 'তপসে মাছ', 'মেম সাহেব', 'পাঁঠা', 'আনারস', প্রভৃতি (কবির কবি-প্রতিভার বিস্তৃত আলোচনায় এগুলি বিশ্লেষিত হয়েছে) বিষয় নিয়ে যে নির্দোষ হাস্যরসের স্ফুরণ সম্ভব, সুন্দর কবিতানির্মাণ সম্ভব, তা ঈশ্বর গুপ্তের রচনা পাঠ না করলে বুঝাই যাবে না। আর এই নির্ভেজাল হাস্যরস আমরা ঈশ্বর গুপ্তেই প্রথম দেখতে পাই। বাঙ্গালী ভাল হাসতে জানে না—এ অপবাদ যদিও অনেক পরের, তবুও এরই যোগ্য জবাব বহুযুগ আগেই 'সেকালের' ঈশ্বরচন্দ্র কেমন সুন্দরভাবে দিয়েছেন। কবিবর ঈশ্বর গুপ্তই প্রথম শিল্পী, যাঁর লেখায় সমসাময়িক বাঙালী সমাজের এক অতি-বাস্তব মনোরম চিত্র ফুটে উঠেছে। মধ্য-যুগের বাংলা সাহিত্যে বাস্তবধর্মের প্রতি নিষ্ঠা ও মনোযোগের অভাব ছিল না বটে, কিন্তু ঊনিশ শতকের সূচনায় গুপ্ত কবির সমকালে আমাদের সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে বিচিত্রতর স্ফুরণ ও বিকাশ দেখা যায়, তাতে বাস্তব চেতনারও নতুনতর অভিব্যক্তি ঘটেছিল। হয়তো একথা বললে অন্যায় হবে না যে, বাংলা

সাহিত্যে 'বাস্তব-রস' ঈশ্বরগুপ্তে এসে বিলসিত ও হিল্লোলিত হয়েছে, চরমস্ফূর্তির পথ উন্মুক্ত করেছে। বাংলার প্রকৃতি, বাংলার ঋতু-ঐশ্বর্য প্রভৃতি কবির কাব্যে বিশেষ রূপ লাভ করেছে। স্বদেশ-সংস্কৃতি ও স্বদেশী সমাজ এক কথায় ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় প্রতিবিম্বিত হয়েছে। এই কারণেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে খাঁটি বাঙগালী কবি বলে অভিনন্দিত করেছেন। দেশের প্রতি ছিল তাঁর গভীর মমত্ববোধ, দেশের সংস্কৃতির প্রতি ছিল তাঁর সশ্রদ্ধ অনুরাগ, দেশের মানুষের প্রতি ছিল তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা। এমনি সহজ প্রাণ ও সরল মনের অধিকারী ছিলেন তিনি। কিন্তু যেখানে তিনি দোষ দেখেছেন, দেখেছেন অন্যায়-অবিচার, সেখানেই তাঁর কলমে যথাযোগ্য তীক্ষ্ণতা দেখা দিয়েছে। কিন্তু, এ কথাও ঠিক যে, তাঁর বিদ্রূপাত্মক কবিতায় নেই কোন বিদ্বেষের চিহ্ন, নেই কোন শত্রু-চিত মনোভাব।

তাই কবিকে বুঝতে হলে তাঁর ব্যক্তি-জীবনকেও বুঝতে হবে, জানতে হবে তাঁর জীবনের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা আনন্দ-বেদনার সুরগুলি। তবেই কবির জীবন-বেদ তথা কাব্য-বেদের প্রোজ্জ্বল সামগান মন্দ্রিত হবে। ব্যক্তিগত জীবনে কবি বিশেষ দুঃখ পেয়েছেন, পেয়েছেন অবিচার। সমাজের কাছ থেকেও তিনি তাঁর আকাঙ্ক্ষিত প্রীতি, সহানুভূতি, শ্রদ্ধা ও সুবিচার তেমন পাননি। তাঁর বিদ্রূপ বা ব্যঙ্গাত্মক রচনার মর্মে তাই এই জীবন-বিলাস-বিতৃষ্ণা, তীব্র দুঃসহ ক্ষোভ, মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যযুগের কাব্য-গগনের অন্যতম প্রজ্বলন্ত জ্যোতিষ্ক কবিকঙ্কণকে মনে করিয়ে দেয়। জীবনে পাননি তেমন আরাম-বিলাস, ভোগ-তৃপ্তি। দারিদ্র্যের কশাঘাতে মাঝে মাঝে জর্জরিত হয়েছেন তিনি,—আবাল্য দুঃখকষ্ট পেয়ে মানুষ

হয়েছেন নিজের চেষ্টায়। জীবনে তিনি অনেক দুঃখকষ্ট পেলেও, সংসারের সেই কষ্টবোধ তাঁর কবি-মনকে শুষ্ক বা নিস্পৃহ করতে পারেনি। তাঁর এই কষ্ট বা দুঃখানুভবই তাঁর কাব্য-নির্মিতিতে স্বতোৎসারিতত্ব সঞ্চার করেছে। বস্তুত, তিনি ছিলেন জীবন-রস-রসিক কবি। বাংলা কাব্যে বা সাহিত্যে একমাত্র কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামকেই এমনি "জীবন-রস-রসিক" কবি আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কবিকঙ্কণকেও তাই এই কবির কাব্যধারা, জীবন-আলোচনা ও জীবনবোধে বড় সগোত্র বলে মনে হয়। জীবনে অশেষ দুঃখ বা বেদনাক্লিষ্টতাই উভয় কবিকে এমনি জীবন সম্পর্কে পরিহাসপ্রিয় করে তুলেছে। উভয়েরই কাব্য-সুষমায় অনাবিল হাস্যরসের স্বতঃপ্রবাহ, সহজ স্ফূর্তি, অনবদ্য লীলা।

কবি ঈশ্বর গুপ্ত 'সহজ রসের'ও কবি ছিলেন। এ'জন্য মেকি জিনিষ তিনি সহ্য করতে পারেননি। আর তাই তাকে প্রয়োজনবোধে গালি দিতেও দ্বিধা করেননি। তাঁর কাব্যে যে সাময়িক অশ্লীলতা দেখি, তাঁর কাব্যে স্ত্রীজাতির প্রতি যে বিদ্রূপাত্মক আক্রমণ দেখি, তার মূলেও এই জীবন-বিলাস-বিতৃষ্ণা বা ভোগ-লালসা-ক্রোধ। এই বিদ্রূপে ক্ষতি করে না, একটু "সেন্টিমেন্টাল" হুল ফুটায় মাত্র। আর, কবিও বোধ করি তাতে প্রতিপক্ষকে জব্দ করে একটু আনন্দ অনুভব করেন। তাঁর কাব্যের প্রধান দোষ যে অশ্লীলতা, এবিষয়ে হয়ত সন্দেহ নাই। কিন্তু যুগ-প্রভাবকে অস্বীকার করা কোন কবি-মানসের পক্ষেই সহজসাধ্য নয়। শুধু এই সামান্য সাময়িক দোষের কথা ভুলে গেলে কবির কাব্যে অনন্ত সম্পদের কিছু কিছু চিহ্ন লুকিয়ে আছে। প্রকৃত সাধক ও কবির সমন্বয় বা মিল সেখানে, যেখানে কবিমন অন্তর্মুখী—ভগবৎসান্নিধ্যে;

ভক্ত ও ভগবানের দিব্য মধুর সম্পর্কে, পিতা ও পুত্রের স্নেহ ও প্রেমসুন্দর আলাপনে। কাজেই কবির এই জীবনদর্শন ও মননশীলতাকে বিশেষভাবে বুঝতে হবে। এখানেই তিনি মহৎ কবি। লক্ষ্য করবার বিষয়, সেকালের লোকে কবির কাব্যের তথাকথিত অশ্লীলতাকেই কতকটা বেশি উৎসাহে সাহিত্যের সামগ্রী বলে সাগ্রহে বরণ করেছে। কিন্তু তাঁর নিজস্ব মনোভঙ্গির মধ্যে কদর্যভাবের কোনই প্রেরণা ছিল না,—ছিল না হৃদয়-ঐশ্বর্যজাত-সৌন্দর্যের অভাব। গুপ্ত কবির কাব্য যেমন রসের বাহক হয়েছে, তেমনি হয়েছে অলঙ্কার-সমৃদ্ধ। অবশ্য তুল্যমূল্যে শেষেরটির পরিমাণই বেশি। এই মণ্ডনপ্রিয়তা তাঁর কাব্যকে অনেক সময় পীড়িত করেছে, কখনও বক্তব্যকে করেছে অস্পষ্ট। শব্দচ্ছটায়, অনুপ্রাস-যমকের ঘটায়, কবিতা অনেক ক্ষেত্রেই মুখরা। কবিতায় যমক ও অনুপ্রাস অলঙ্কারের এত বেশি প্রয়োগ প্রথমে ভারত-চন্দ্রেই বিশেষভাবে প্রমূর্ত হয়েছে। এই অলঙ্কার-প্রয়োগে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন সে যুগের আরো অনেক কবি; যেমন বিখ্যাত পাঁচালীকার বিদগ্ধ রসিক দাশরথি রায়ের নাম মনে পড়ে। কবি ঈশ্বর গুপ্ত এঁদেরই অনুসরণ বা অনুগমন করেছেন বলা যায়। এই শেষোক্ত দুই কবিকে অনুপ্রাস ও যমক অলঙ্কারের এত বেশি প্রয়োগ এবং মূলত এই অলঙ্কার-প্রীতি, কাব্য-সুন্দরীকে বিবিধ অলঙ্কারে সাজিয়ে তার রূপ দেখা ও দেখানোর উচ্ছ্বাস বা আগ্রহ মাঝে মাঝে এতটা মোহাচ্ছন্ন করেছে যে, উভয়ের কবি-সংবিৎ তখনই গেছে হারিয়ে, উভয়ে তখন হয়ে উঠেছেন নিপুণ মণিকার। কবি-সত্তা অনেকটা তখন কারিগরি-সত্তায় ত। কবি ঈশ্বর গুপ্তের উপরেও এই প্রভাব সুস্পষ্ট

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র সম্বন্ধে আর কোন উল্লেখ্য কথা বলা যায় না যা তাঁকে তাঁর আসল পরিচয়ের গণ্ডি থেকে দূরে সরিয়ে নিতে পারে। আসলে কবিকে নিরপেক্ষ সমালোচকের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে এর বেশি অপরাধে বা দোষে (শুধু কাব্য-সৃষ্টি-ক্ষেত্রের কথাই বিবেচ্য) তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না যদিও এই দোষগুলিই সর্বাধিক পরিমাণে ছিল মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের 'মধ্যমণি' কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রে। যথার্থ বৈদগ্ধ্য, অগাধ পাণ্ডিত্য, অসামান্য কবি-প্রতিভার অধিকারী হয়েও ভারতচন্দ্রও এই দোষমুক্ত হতে পারেননি; অন্যভাবে বললে সেই যুগের সর্বাতিশায়ী প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারেননি। কবি ভারতচন্দ্রের "অন্নদা মঙ্গল"-এর এক-তৃতীয়াংশ তো বটেই, বোধ হয় সর্বাধিক প্রসিদ্ধ অংশই হল "বিদ্যাসুন্দর"। যথার্থ সাহিত্য-রসিক ও প্রকৃত সংস্কৃতি-অনুরাগীর চোখে 'বিদ্যাসুন্দরের' একটা বিশেষ আবেদন আছে, যা কবিবর ঈশ্বর গুপ্তের অধিকাংশ (অবশ্য কয়েকটা ছাড়া) তথাকথিত অশ্লীলতা-চিহ্নিত কবিতাগুলির তেমনি যুগোপ-যোগী আবেদন নেই, একথা বললে সত্যেরই অপলাপ করা ছাড়া আর কিছুই হবে না। বিদেশী সাহিত্যেরও, বিশেষ করে ইংরেজী সাহিত্যের অনেক শক্তিমান কবির রচনায়ও এমনি অশ্লীলতা বা অসংযত বাক্যবিন্যাস কম বেশি দেখতে পাওয়া যায়। তাছাড়া কবিবর ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে বিখ্যাত পারসিক অমর কবি ওমর খৈয়মেরও খানিকটা মিল আছে। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয়, ওমর খৈয়মও ইন্দ্রিয়-সেবার বাণী প্রচার করেছিলেন, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা তাঁর কাব্যে লঘুভাবে ছন্দিত হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে কোন দৃঢ়ভিত্তি ছিলনা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-ভোগাসক্তি বা ইন্দ্রিয়-আরতিই একমাত্র উপজীব্য নয়, প্রধান

উপাদানও নয়। একান্ত নৈরাশ্য থেকেই অনেকটা ক্ষোভ-দুঃখ ভোলবার জন্যেই যেন তিনি এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। কবি ঈশ্বরচন্দ্রের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি।

ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়গুলি অনেকটা কবির অলঙ্কারের দোলায় চড়ে বেশ সবেগে পাঠকের চিত্ত-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করেছে, কখনও বা উঁকি দিয়েই পালিয়ে গিয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় যে, কবি এই অলঙ্কারকে নিজের নিজের বিশিষ্ট বক্তব্যের বাহন করেছেন। যেন তাঁর আজ্ঞাবহ ভৃত্য, তাদের দিয়ে কবি যেমন খুশি রূপ গড়েছেন। এই অলঙ্কার-লোলুপতা, এই অতি-অলঙ্কার প্রীতি বা মণ্ডনাতিশয্য যদি তিনি সংযমের সঙ্গে মিশিয়ে নিতেন এবং কবিতার প্রাণসম্পদ যে কাব্যত্ব তথা রসাত্মকতা তার প্রতি অভিনিবেশ করতেন, তাহলে তাঁর অনেক কবিতাতে যথার্থ কাব্যোৎকর্ষ পরিলক্ষিত হতো। অনুপ্রাসের দোলায় ও ছন্দের সুরে তিনি অনেকটা বিভোর হয়ে যেতেন, রচনাকালীন "কবি-সংবিৎ" তাতেই যেত হারিয়ে। আর এজন্যেই ঈশ্বর গুপ্তের প্রথম শ্রেণীর কবি-প্রতিভা থেকে আমরা হয়তো বঞ্চিত হয়েছি খানিকটা।

কিন্তু তবু বাঙালী সারস্বত সমাজ তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ ও ঋণী থাকবে, তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে—একজন শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে না হলেও, একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালী হিসেবে, একজন খাঁটি বাঙালী কবি হিসেবে, একজন প্রকৃত স্বাদেশিক কবি হিসেবে, একজন পরম ভাগবত কবি-সাধক হিসেবে (যেখানে সাধক কবি রামপ্রসাদ তাঁর অতি সগোত্র), "সংবাদ প্রভাকরের" সম্পাদক হিসেবে, নতুন ও পুরাতন যুগের সেতু-নির্মাতা হিসেবে, বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম ইংরেজী সাহিত্যাদর্শ ও

সাহিত্যধারার প্রবর্তক হিসেবে, পরবর্তী কালের বাংলা সাহিত্য-জগতের বহু প্রতিভা ও মনীষার সৃষ্টি ও বিকাশ-সহায়ক হিসেবে, একজন স্বদেশপ্রেমিক, তেজস্বী অথচ পরদুঃখকাতর জীবনরসিক হিসেবে, একজন মনীষী দার্শনিক হিসেবে।

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্রের এই প্রতিভাকে প্রথম রসিক-সমাজের গোচরে আনেন বঙ্কিমচন্দ্র। আর এই বঙ্কিমচন্দ্রই আমাদের মতে কবির সর্বশ্রেষ্ঠ সমালোচক;—তিনি কবিকে যেমন বুঝেছেন, যেরূপ বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর কবি-স্বরূপ, আর কেউ এ'পর্যন্ত তেমন করেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রই সে যুগের যথার্থ কবি এবং কবি-প্রেমিক। আমাদের দুর্ভাগ্য, একালের, অর্থাৎ খুব সাম্প্রতিক কালের পাঠকরা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাও পাঠ করবার অবসর দেখে না—নইলে কবি ঈশ্বর গুপ্ত এত সহজেই এ কালের পাঠক-দৃষ্টির বহির্ভূত হয়েছেন কেন? কেউ যদি এজন্য তাঁর কাব্যের অশ্লীলতা বা কাব্যোৎকর্ষের অভাব বা অলঙ্কার-প্রয়োগ-বাহুল্যকেই একমাত্র কারণ নির্দেশ করেন, তাহলে আমরা বলব, ঠিক তা নয়, যদিও এইগুলি অন্যতম কারণ। আমাদের মতে প্রধান কারণ—ঔৎসুক্য ও আগ্রহের অভাব, যথার্থ সংস্কৃতি ও সাহিত্যানুরাগের অভাব এবং জাতীয় সংস্কৃতি বা ঐতিহ্য বা ভাবধারার প্রতি শ্রদ্ধার অভাব।

বঙ্কিমচন্দ্রও এই কথাই বিশেষভাবে বলেছেন। সাহিত্যে গুরুঋণ তিনি স্বীকার করেছেন বরণীয় রূপে ও অভিনব রচনাশৈলীর মাধ্যমে। কিছুমাত্র অত্যুক্তি নেই তাঁর আলোচনায়, কিছুমাত্র নেই বাগ্‌-বিভূতি। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে ও ধারণায় অনুস্যূত তাঁর বিশেষ উপলব্ধি বা জীবনবোধই কবি ঈশ্বর

গুপ্তের উপর আলোচনাটিকে এতটা মূল্যবান, এতটা সরস ও এতটা আকর্ষণীয় করেছে। বড় কথা—কবিকে বুঝতে হলে, তাঁর সৃষ্টি-সত্তা ও স্বরূপকে বুঝতে হলে চাই সহানুভূতি,—সহানুভূতির অভাব ঘটলে কবি-মনকে বোঝা যায় না যথার্থ ও সার্থকভাবে। সহানুভূতিই রস-প্রেরণার স্বরূপ উদ্ঘাটন করে,—সহানুভূতি-স্নিগ্ধ আলোচনাই যথার্থ সমালোচনার ভিত্তি। আর এই আলোচনার দর্পণেই কবির কাব্যের সন্তরঙ্ প্রতি-ফলিত হয়। অতি-আভিজাত্য, অতিশিক্ষা বা সংস্কৃতিরুচিতে ও দৃষ্টিতে যাঁকে নিছক অশ্লীলতার কবি বলে উন্নাসিকতা দেখান হয়, সহানুভূতিপূর্ণ প্রকৃত রসবেত্তার দৃষ্টিতে বা পরিশীলিত অনুভূতিতে তিনি হবেন খাঁটি কবি,—বাস্তবতার কবি, সত্যের কবি। ঈশ্বর গুপ্ত খাঁটি বাঙ্গালী কবি, যার তুলনা সে যুগেও ছিল না, এ যুগেও নেই; বাঙ্গালী হয়ে তাঁর কাব্যরসানুমোদনে অনীহা দেখানো সত্যিই দুঃখ ও লজ্জার বিষয়। আজকের এই 'মেকির' যুগে, ভেজালের যুগে, কৃত্রিমতার যুগে, অনাচার ও দুর্নীতির যুগে, বিকৃত রুচির যুগে, এমন 'খাঁটি' কবির, এমন 'স্বাদেশিক' কবির, এমন নির্ভীক কবিরই আজ বিশেষ প্রয়োজন মনে হয়। তাঁর কালের স্বরূপ বোঝবার জন্যেই এখানে অংশতঃ একটু আলোচনা স্মরণ করা গেল—

> শিক্ষা-বিষয়ে গুপ্তকবির আবির্ভাব কালে বাংলাদেশ কি পরিমাণে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভিমুখী হয়েছিলো, সে সম্বন্ধে এখানে মোটামুটি পরিচয় দেওয়া হলো। শ্রীরামপুর মিশন, ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজ, স্কুল-সোসাইটি ও স্কুল-বুক্-সোসাইটি, বিভিন্ন সমিতি, মহা-বিদ্যালয়, হেয়ার. ডিরোজিও-রিচার্ডসন-মেকলে-রামমোহন রায়-ঠাকুর-পরিবার এবং বড়লাট বেন্টিংকের সহায়তায় সে যুগে বাংলার শিক্ষার্থী পাশ্চাত্য ঐশ্বর্যের অন্বেষণে প্রভূত আগ্রহশীল ছিলেন। বাংলাদেশে

পাশ্চাত্য শিক্ষার এই শৈশব কালেই প্রাক্-রবীন্দ্র বাংলা কাব্যের শৈশব-পর্ব সুরু হলো।

জাতীয় জীবনে শিক্ষার সংগে সংগে ধর্মেরও পরিবর্তন ঘটে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় তাই ধর্মগত আন্দোলনও কিছু কম হয়নি। বাঙালীর চিন্তার ক্ষেত্রে সে যুগে যতো তুমুল বিপ্লব ঘটেছিলো, তা'র প্রধান নেতৃমণ্ডলীর মধ্যে রাজা রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব, ডেভিড্ হেয়ার, হেন্‌রি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। হিন্দু ধর্মের আচারনিষ্ঠা এবং সংস্কার-বন্ধন পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্পর্শে এসে আর অক্ষুণ্ণ থাকতে পারলো না। রামমোহন রায়ের সতর্ক দৃষ্টিতে এই বন্ধন মোচনের আসন্ন সম্ভাবনা প্রথম ধরা পড়লো। ১৮১৫ অব্দে তাঁর বেদান্তবিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বাংলা ১২২৮ সালে তারাচাঁদ দত্ত এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সম্বাদ কৌমুদী' নামে যে সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন, রামমোহন সেই পত্রে সতীদাহ-প্রথার বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করলেন। *ভবানীচরণ এই কারণে সম্পাদকের পদ ত্যাগ করায় রামমোহন স্বয়ং 'কৌমুদী' প্রকাশের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে সতীদাহপ্রথা বেন্টিংকের সহায়তায় আইনানুসারে নিষিদ্ধ হলো।

এই 'সম্বাদ-কৌমুদী' পত্রের আবির্ভাব অন্তত কিয়দংশে সে যুগের ধর্মকলহের তাগিদেই সম্ভব হয়েছিলো। প্রসংগত এখানে বিশেষজ্ঞ গবেষকের একটি উক্তি তুলে দেখা যাকঃ—

'সম্বাদ কৌমুদী' প্রকাশের আর একটি উদ্দেশ্যও ছিল। পরধর্মের হীনতা প্রমাণ করা বা খ্রীষ্টধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার 'সমাচার দর্পণের' উদ্দেশ্য না হইলেও প্রথমাবস্থায় উহাতে এমন কতকগুলি "প্রেরিত পত্র" প্রকাশিত হয় যাহাতে হিন্দুশাস্ত্রের যুক্তিহীনতা, কুলীনদের প্রতি কটাক্ষ, প্রভৃতি ছিল। এই কারণে হিন্দুরা একখানি বাংলা সমাচারপত্রের অভাব

*'সংবাদ কৌমুদী'র প্রথম সংখ্যা ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে প্রকাশিত হয়।

বিশেষ করিয়া অনুভব করিতেছিলেন। এমন সময় কলুটোলা নিবাসী তারাচাঁদ দত্ত এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সম্বাদ কৌমুদী' নামে একখানি বাংলা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিলেন। এই পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এই মর্মে লেখা হইলঃ—"লোকহিতসাধনই এই সংবাদ প্রচারের প্রধান লক্ষ্য...দেশবাসীর অভাব অনুযোগের কথাও ইহাতে ভদ্রভাবে প্রকাশ করা হইবে।"*

এদিকে 'সম্বাদ-কৌমুদী' পত্রে সতীদাহ-প্রথার বিরুদ্ধে রচিত প্রবন্ধাবলীর বিরোধিতাকল্পে রক্ষণশীল হিন্দুরা নিজেদের প্রয়োজনে আর একখানি সাপ্তাহিক পত্রের পত্তন করলেন। এই কাগজখানির নাম 'সমাচার চন্দ্রিকা'। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মার্চ তারিখে 'সমাচার চন্দ্রিকা'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। 'সম্বাদ-কৌমুদীর' ভূতপূর্ব সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পত্রিকা সম্পাদনের দায়িত্ব নিলেন। 'সম্বাদ কৌমুদীর' সংগে 'সমাচার-চন্দ্রিকার' প্রবল মসিযুদ্ধ আরম্ভ হলো। এদিকে ১৮৩০ অব্দের ১৭ই জানুয়ারী, প্রাচীনপন্থী হিন্দুদের উদ্যোগে এক 'ধর্মসভার' প্রতিষ্ঠা হয়,—সেই সভার সম্পাদক হলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকের ধর্মকলহ প্রসংগে আরো একখানি পত্রিকার নাম অবশ্য স্মরণীয়। সে কাগজটির আবির্ভাবের একটু ইতিহাস আছে। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই তারিখের 'সমাচার দর্পণে' একটি পত্রে হিন্দুশাস্ত্রের কোনো কোনো যুক্তিহীনতার বিরুদ্ধে কটাক্ষপাত সূচিত হয়; রামমোহন রায় এই পত্রের প্রতিবাদ স্বরূপ 'শিবপ্রসাদ শর্মা'—

*দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

এই ছদ্মনামে একখানি চিঠি পাঠালেন। সেই চিঠি যখন ছাপা হলো না, তখন, রামমোহন 'Brahmunical Magazine. The Missionary and the Brahmun, ব্রাহ্মণ সেবধি। 'ব্রাহ্মণ ও মিসিনরি সম্বাদ'—এই নামে একখানি কাগজ প্রকাশ করেন। এই কাগজের এক পৃষ্ঠায় বাংলা এবং অপর পৃষ্ঠায় ঐ অংশের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হতো। এই পত্রিকার মূল অভিযোগটি প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত একটি উক্তিতে স্পষ্টই চোখে পড়ে—

"...ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ যাঁহারা মিসনরি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে ব্যক্ত রূপে তাঁহাদের ধর্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খ্রীষ্টান করিবার যত্ন নানা প্রকারে করিতেছেন।"*

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস' গ্রন্থে ধর্মকলহের তাগিদে প্রকাশিত এই শ্রেণীর আরও কয়েকটি কাগজের উল্লেখ ও বিবরণ দেখা যায়। এখানে এই তালিকা দীর্ঘ করবার অবকাশ নেই। সুতরাং আর একটি মাত্র পত্রিকার উল্লেখ করে প্রসংগান্তরের অবতারণা করাই বাঞ্ছনীয়।

কেবলমাত্র ধর্মসম্পর্কিত ব্যাপারে নয়,—সে সময়ে সমাজের সর্বত্র দলাদলির বিশেষ রেওয়াজ ছিলো। এই ব্যাপারে উৎসাহী জনসাধারণের জন্য সে যুগে একখানি বাংলা কাগজও প্রকাশিত হয়েছিলো। সেই পত্রিকার নাম 'দলবৃত্তান্ত'। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে এই পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। অবশ্য এর বিপরীত আদর্শের উপাসনাও যে না ছিলো, এমন নয়। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুন তারিখে 'জ্ঞানান্বেষণ' নামে যে পত্রিকা

---

* 'ব্রাহ্মণ-সেবধি'—প্রথম সংখ্যা—তৃতীয় সংখ্যা; রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থাবলী (১৭৯৫ শক) তে দ্রষ্টব্য।

প্রকাশিত হয়, তাতে উদার যুবকদের মতামত ব্যক্ত হতো। পরবর্তী কালে যিনি 'সংবাদ-ভাস্কর' পত্র প্রকাশ করেন, সেই গৌরীশংকর তর্কবাগীশ কিছুকাল এই পত্রের বাংলা বিভাগের সম্পাদনা করেন।

শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম ও রাজনীতির এই আলোড়নচিহ্নিত যুগসন্ধিতে ঈশ্বর গুপ্তের লেখনী বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলো। ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের ১১ই জানুয়ারী বাংলায় 'সংবাদ-প্রভাকর' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশের অনুমতি দেওয়া হলো। এজন্য যে আবেদনটি লেখা হয়েছিলো, তার ভাষা ইংরেজী হলেও তার স্বাক্ষর ছিলো বাংলায়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই সেই অবেদনকারী। পাথুরিয়া ঘাটের যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর এ বিষয়ে প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। ২৮-এ জানুয়ারি তারিখে কাগজের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হ'লো। 'সংবাদ প্রভাকর' এই সময়ে সাপ্তাহিক পত্রিকা রূপেই প্রকাশিত হয়। বহু চাঞ্চল্য-বিক্ষুব্ধ, বাংলাদেশের এই নবীন কবি ঈশ্বর গুপ্তের অন্তরে, স্বজাতি ও মাতৃভাষার প্রতি যে গভীর অনুরাগ ছিলো, তা 'প্রভাকর পত্রিকার' পূর্বোক্ত আবেদন-পত্রের স্বাক্ষর থেকেই বোঝা যায়। এই পত্রিকা প্রকাশের অন্যান্য সহায়ক যাঁরা ছিলেন, তাঁদের পাণ্ডিত্য তখন এদেশে সুবিদিত। জয়গোপাল তর্কালংকার ছিলেন। তা'ছাড়া সংস্কৃত কলেজের অলংকার শাস্ত্রের অধ্যাপক প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ "লিপিবিষয়ে বিস্তর সাহায্য" করেছিলেন। 'সংবাদ-প্রভাকর' প্রকাশিত হবার তিন মাস পূর্বে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতৃবিয়োগ হয়। তখন তাঁর বয়স মাত্র ঊনিশ বৎসর। তার বহু পূর্বে, কবির দশ বৎসর বয়সে মাতৃবিয়োগ ঘটে। পিতা হরিনারায়ণ গুপ্ত দরিদ্র কবিরাজ ছিলেন। পরে শেয়ালডাঙগার কুঠীতে মাসিক আট

টাকা বেতনে তিনি চাকুরিতে নিযুক্ত হন। কবির জন্ম হয় কাঁচরাপাড়ায়,—১২১৮ বংগাব্দের ২৫এ ফাল্গুন। এই কাঁচরা-পাড়ার দক্ষিণে অবস্থিত কুমারহট্ট গ্রামেই কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের জীবনচরিত সম্বন্ধে বংকিমচন্দ্র-লিখিত একটি প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে, শৈশবে তিনি লেখাপড়ায় মনোযোগী ছিলেন না। শিশুকালেই তিনি কাব্য রচনার শক্তি প্রদর্শন করেন। বাল্যকালে তিনি জীবিকান্বেষণ এবং ইংরেজি বিদ্যাভ্যাসের উদ্দেশ্যে কলকাতায় পদার্পণ করেন। এখানে ঠাকুরবাড়ীর সংস্কৃতির সম্পর্কে এসে ঈশ্বর গুপ্ত নিজের জীবনের পথ খুঁজে পেলেন।

> 'কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঠাকুর বংশের সংগে ঈশ্বর গুপ্তের মাতামহ বংশের পরিচয় ছিল। সেই সূত্রে ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়াই ঠাকুর বাটীতে পরিচিত হয়েন। পাথুরিয়াঘাটের গোপীমোহন ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের বিশেষ সখ্য জন্মে।... যোগেন্দ্রমোহনই ঈশ্বরচন্দ্রের ভাবী সৌভাগ্যের এবং যশঃকীর্তির সোপান স্বরূপ।'*

একটি কবিতায় ঈশ্বরচন্দ্র লিখেছিলেন,

যে ভাষায় হোয়ে প্রীত, পরমেশ-গুণ-গীত
বৃদ্ধকালে গান কর মুখে।
মাতৃসম মাতৃভাষা, পুরাকালে তোমার আশা
তুমি তার সেবা কর দুখে॥ †

যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহায়তায় অতি তরুণ বয়সে গুপ্তকবি এই মাতৃভাষার সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন।

সাহিত্যক্ষেত্রে গুপ্ত-কবির কাজ বহুধা প্রকাশিত। তিনি

* 'গুপ্তের কবিত্ব'—বংকিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

† মাতৃভাষা।

একাধিক পত্রিকা পরিচালনা করেন, বহু গদ্য-পদ্য রচনায় দেশের পাঠকমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন এবং তদ্ব্যতীত প্রাচীন কবিদের জীবনী ও রচনা সংগ্রহকার্যে তিনি স্মরণীয় দক্ষতার পরিচয় দেন। 'সংবাদ প্রভাকর', 'সংবাদ-রত্নাবলী', 'পাষণ্ড-পীড়ন' এবং 'সংবাদ-সাধুরঞ্জন'—এই পত্রিকাগুলি তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। এখানে এই সব বিভিন্ন সাহিত্যিক প্রচেষ্টার বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই।*

[উপরের আলোচনা আমার এই গ্রন্থ রচনার প্রয়োজনীয়তাকেই স্মরণ করিয়ে দেবে। এযুগেও কেন কবিবর ঈশ্বরচন্দ্রকে স্মরণ করব—বা তাঁকে জানবার ও বুঝবার কি সার্থকতা উপরের আলোচনায় তারই কিছু আভাস মিলবে। এই গ্রন্থ-রচনার প্রস্তাবনা ও কৈফিয়ৎও এই সঙ্গে উক্ত-আলোচনায় বিধৃত। সাহিত্যরসিক হিসেবে 'সাহিত্যঋণ' স্বীকার করার জন্যই আমার এই গ্রন্থ রচনার প্রয়াস এবং সেই সঙ্গে উৎসাহী ও কৌতূহলী রসিক পাঠক সমাজ ও সারস্বত সমাজের দৃষ্টিও এ'বিষয়ে আকর্ষণ করার মৌল উদ্দেশ্য নিয়েই এই গ্রন্থ রচনার সূত্রপাত। গ্রন্থের পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাব্য ও সাধনার ক্রমবিকাশ ও আলোচনা যথাসাধ্য বিশ্লেষিত এবং উপস্থাপিত করার চেষ্টা হয়েছে। আমার এই আলোচনা বাংলা সাহিত্যের রসিক পাঠককুলের স্বীকৃতি পেলেই এই অতিপ্রয়োজনীয় গ্রন্থ-রচনা-প্রচেষ্টা সার্থকতামণ্ডিত হবে বলে মনে করি।]

* 'বাংলা কাব্যে প্রাক্-রবীন্দ্র—হরপ্রসাদ মিত্র।

গুপ্ত কবির আবির্ভাব

জন্মভূমি ধন্য হয় তাঁর সন্তানের গর্বে। কবিবর ঈশ্বর গুপ্তের জন্মভূমি কাঞ্চনপল্লীর ধ্বংসস্তূপ ও জঙ্গলাকীর্ণ প্রান্তর দেখে এর অতীত ঐতিহ্য ও গৌরবের কথা বিশ্বাস করাই শক্ত। এককালে এই অঞ্চল ছিল বাংলাদেশের সারস্বত রাজধানী। শ্রীচৈতন্য দেবের সময় ইহা ছিল হাবেলি সহর পরগণার অন্তর্গত, তার দক্ষিণে ছিল রামপ্রসাদের লীলাভূমি কুমারহট্ট বা হালিসহর। গুপ্ত কবির জন্ম সময়ে এটা ছিল কুমারহট্টের অন্তর্গত পল্লী। সেই সময়ে এই অঞ্চল নদীয়া জেলার অন্তর্গত ছিল। গাঙ্গেয় সংস্থা ও সংস্কৃতি ক্রমশঃ এখানেও প্রসার লাভ করছিল। ভাগীরথীর পূর্বকূলে কাঞ্চনপল্লী, কুমারহট্ট বা হালিসহর, ভট্টপল্লী প্রভৃতি ছিল সেযুগের সংস্কৃতচর্চার এক একটি প্রধান কেন্দ্র। শুধু সংস্কৃত চর্চা কেন, এখানে আবির্ভূত হয়েছেন বহু কবি সাহিত্যিক ও সাধকবৃন্দ।

কুমারহট্টের বিখ্যাত পরিবার ছিল চৌধুরী পরিবার। এঁরা পূর্ববঙ্গ ও ভাগীরথীর অপর কূল থেকে বিভিন্ন পরিবার এনে কুমারহট্টে বসতি করিয়েছেন। ক্রমে এই অঞ্চল সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র হয়ে ওঠে; বিশেষত আয়ুর্বেদশাস্ত্রের পঠন-পাঠনের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠে কাঞ্চনপল্লী অধুনা কাঁচড়াপাড়া। এই অঞ্চলের চিকিৎসকগণের খ্যাতি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। কুমারহট্টের শ্রীচৈতন্য-দীক্ষাগুরু বিখ্যাত বৈষ্ণব সাধক শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর উৎসাহে এই অঞ্চল বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম কেন্দ্র

হয়ে উঠে। এই অঞ্চলের যে বহু ভক্ত শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছিলেন, তার উল্লেখ "শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে" আছে। সেন শিবানন্দ এবং তাঁর তিনপুত্র চৈতন্যদাস, রামদাস ও পরমানন্দ দাসের নাম এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সেন শিবানন্দ তাঁর কুলগুরু শ্রীনাথ পণ্ডিতের নামে তাঁর আবাসপল্লীতে সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণদেব রায়ের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিগ্রহ তখন "কৃষ্ণরায়জী" নামে খ্যাত ছিল। শ্রীনাথের বংশ আজও এই মন্দিরের সেবাইত।

কাঞ্চনপল্লীর তৎকালীন প্রসিদ্ধ মুখোপাধ্যায় বংশের গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামে এক সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিই সর্বপ্রথম কবি ঈশ্বর গুপ্তের পরিচয়-দ্বার উন্মুক্ত করেন এবং গুপ্ত-কবির কোন কোন অপ্রকাশিত রচনা ও কবির জীবনী সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রকে দেন। বঙ্কিমচন্দ্রও এ-কথা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেছেন এবং গুপ্ত কবিকে সারস্বত সমাজে পরিচিত করেছেন বিশিষ্টভাবে। গুপ্ত কবির প্রপিতামহ নিধিরাম একজন সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ ছিলেন, তাঁরও কবিখ্যাতি ছিল। সে আমলের পণ্ডিত-সমাজ তাঁকে 'কবিভূষণ' উপাধি প্রদান করেন। তাঁর আর এক পূর্বপুরুষ বিজয়রাম সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য "বাচস্পতি" উপাধি লাভ করেন। গুপ্ত কবির পূর্বপুরুষদের মধ্যেও এইভাবে সংস্কৃত ও সংস্কৃতি-চর্চা অব্যাহত ছিল।

ইংরেজি বা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রথম তরঙ্গ তখন দেশের প্রাচীন শিক্ষা-সংস্কৃতি-বিন্যাসের মূলে বহুধা পরিবর্তনের আঘাত হানতে শুরু করেছিল। দেশের ভদ্রসমাজ তখন নিছক সংস্কৃতচর্চা ত্যাগ করে নতুন ইংরেজিশিক্ষা গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছে এবং ইংরেজিয়ানার প্রভাবে পিতৃপুরুষের বৃত্তি

ত্যাগ করে ইংরেজেরই বিভিন্ন কুঠিতে সামান্য চাকরির দাসত্ব বরণ করতে প্রলুব্ধ হয়েছেন। ফলে গুপ্ত কবির পিতাও তাঁর কবিরাজী বৃত্তি ত্যাগ করে শেয়ালডাঙ্গার ইংরেজ কুঠিতে চাকরি গ্রহণ করেন। কাঞ্চনপল্লীর উচ্চশ্রেণীর অধিবাসিগণের অধিকাংশই এভাবে মোহগ্রস্ত হয়ে নবযুগের নবতর কর্মব্যপদেশে জন্মভূমি পরিত্যাগ করতে থাকেন। এভাবে এক কালের এই সমৃদ্ধ কাঞ্চনপল্লীর কাঠামো ভেঙে পড়ে।

পাশ্চাত্য শিক্ষার এই মোহ কবি ঈশ্বর গুপ্তকেও খানিকটা বিচলিত করেছে। তিনিও কিশোর বয়সে ইংরেজি শিক্ষার অভিলাষে কলকাতার জোড়াসাঁকোয় তাঁর মাতামহ-ভবনে বাস করতে থাকেন। কিন্তু ঈশ্বরের বাসনা ছিল অন্যরূপ। তখন কে জানত যে, বঙ্গের নিভৃত পল্লীর এক অতি নগণ্য সন্তান তাঁর কবি-প্রতিভায় চরাচর ব্যাপ্ত করবেন! সেকালে কবি ঈশ্বর গুপ্তের জীবনে, কলকাতায় গমন ও ইংরেজি শিক্ষানুরক্তি শাপে বর হয়েছে, নইলে তাঁর সামর্থ্যের সমুচিত স্ফূরণ সম্ভব হোতোনা। শতাধিক বৎসর পূর্বে কবির লেখনী যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে—তার সত্যতা সেযুগে বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন সেযুগের পাঠকসমাজ। তাঁর সেই ভবিষ্যদ্বাণী আজও স্মরণীয় :

"কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত, ব্যাপ্ত চরাচর।
যাহার প্রভায় প্রভা, পায় প্রভাকর॥"

কিন্তু তিনি যখন মাতৃভাষার সেবায় ব্রতী হন, তখন বাঙ্গালীর কাছেই বাংলা ভাষা ছিল তাচ্ছিল্য ও ব্যঙ্গের বস্তু। একদিকে গোঁড়া সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের দল, অন্যদিকে ইংরেজী-নবীশের দল, বাংলাকে এই দুই দলেই শিক্ষণীয় ভাষা বলে

স্বীকার করতে যেন কুণ্ঠাবোধ করত। গুপ্ত কবি তাই সখেদে বলেছিলেন :

"হায় হায় পরিতাপে পরিপূর্ণ দেশ
দেশের ভাষার প্রতি সকলের দ্বেষ।
* * *
অপমান আপনার প্রতি ঘরে ঘরে
কোন মতে কেহ নাহি সমাদর করে॥"

মাতৃভাষার প্রতি অবহেলা-অনাদরের সেই দুর্যোগময় যুগে তিনিই মাতৃভাষার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং তাকেই জীবনের ব্রত ও জীবিকাস্বরূপ বরণ করেন,—সহায়-সম্পদহীন, নিঃসঙ্গ এক অসমসাহসিক যুবক এই ঈশ্বর গুপ্ত জোড়াসাঁকোতে তাঁর মাতুলালয়ে অবস্থানের সময় পাথুরে-ঘাটার পরম বিদ্যোৎসাহী ও দানশীল যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের উৎসাহ-আনুকূল্যে "সংবাদ প্রভাকর" পত্রিকার সূত্রপাত করেন (২৮এ জানুয়ারী, ১৮৩১ খ্রীঃ বাংলা ১২৩৭ সালের ১৬ই মাঘ); এমনি ভাবে সংস্কৃত নবন্যায় ও আয়ুর্বেদচর্চার অন্যতম কেন্দ্র টোল-চতুষ্পাঠী পরিকীর্ণ কুমারহট্ট, কাঞ্চনপল্লীর গোঁড়া রক্ষণশীল পরিবেশের মধ্য থেকেই আবির্ভূত হলেন—বঙ্গসাহিত্য যজ্ঞের প্রথম হোতা, প্রথম খাঁটি বাঙ্গালী কবি ঈশ্বর গুপ্ত। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণার মূলে যেমন ছিলনা সংস্কৃত পণ্ডিতদের অনুশাসন বা প্রভাব, তেমনি ছিলনা পাশ্চাত্য বিধির অক্ষম অনুকরণ-প্রচেষ্টা। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ইংরেজি শিক্ষার মোহে প্রমত্ত ও বিভ্রান্ত বঙ্গসন্তানগণ যখন 'বাংলা জানিনা' বলতে গর্বানুভব করতেন, স্বদেশের সর্বপ্রকার রীতিনীতি, পালপার্বণ, ধর্ম, সমাজ, প্রভৃতি, এমনকি ইংরেজি শিক্ষা যাদের ছিলনা, সমাজস্বজন ও স্বদেশবাসীর প্রতিও

ঘৃণার ভাব পোষণ করতেন এমনি দুর্যোগের মধ্যে গুপ্ত-কবি ব্যঙ্গের তীব্র কশাঘাতে বা উপদেশের অমৃত-বাণীতে বিপথ-গামী দেশবাসীর মনে প্রথম দেশাত্মবোধের বীজ রোপণ করলেন :

"জাননা কি জীব তুমি, জননী জন্মভূমি
যে তোমারে হৃদয়ে রেখেছে।
থাকিয়া মায়ের কোলে, সন্তানে জননী ভোলে
কে কোথায় এমন দেখেছে?"

বিদেশের বহুমূল্য তথাকথিত সম্মানের আসনও অবহেলা করে স্বদেশের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তুকে আদর করার জন্য তিনিই প্রথম দেশবাসীকে আহবান করলেন; তিনিই—স্বদেশপ্রেমের মন্ত্র প্রথম উচ্চারণ করলেন :

"ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসীগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া
কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।"

বাঙালীর ইংরাজ-অনুকরণকে ব্যঙ্গ করে কবি বলেছেন :

বুঝি হুট বোলে, বুট পায়ে
চুরুট ফুঁকে স্বর্গে যাবে।"

নীলকরসমাজকে,—এবং প্রায় একই নিঃশ্বাসে মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে লক্ষ্য করে তিনিই সতর্ক করেছিলেন :

হলে ভক্ষকেতে রক্ষাকর্তা, ঘটে সর্বনাশ
বাঙালী তোমার কেনা, একথা জানেনা কে না?
হয়েছি তো চিরকেলে দাস।
তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গরু
খাব কেবল খোল বিচালি ঘাস।"

তিনিই বলেছেন :

"নিজ মান চাহ শুদ্ধ, কারে নাহি মানি
সে মানে কে মানে ভাই, কি সে হবে মানী ?
* * *
পরধন লইতেছ বিস্তারিয়া কর
মরণ নিকট অতি স্মরণ না কর।"

অন্ধ ইংরেজিয়ানা যখন বঙ্গললনাদের মধ্যেও ক্রমে সংক্রামিত হতে দেখা দিয়েছে, তখন আতঙ্কিত গুপ্ত-কবিই বলেছেন :

"আর কি এরা তেমনি করে
সাজ সেঁজুতির ব্রত নেবে ?
আর কি এরা আদর করে
পিঁড়ি পেতে অন্ন দেবে ?
(এরা) এ, বি, পড়ে, বিবি সেজে
বিলিতি বোল কবেই কবে,
পর্দ্দা তুলে ঘোমটা খুলে
সেজেগুজে সভায় যাবে।
'ড্যাম হিন্দুয়ানী' বলে
বিন্দু বিন্দু ব্র্যাণ্ডি খাবে,
(এরা) আপন হাতে হাঁকিয়ে গাড়ী
গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।"

গুপ্ত কবির কবিতাবলীর অধিকাংশই ব্যঙ্গরসাশ্রিত। এখনকার বাঙ্গালীর উন্নতরুচির কাছে এ সকল কিঞ্চিৎ স্থূল ও রূঢ় মনে হলেও তখনকার বিপথগামী বঙ্গসমাজের সংশোধনের জন্য এর বিশেষ প্রয়োজন ছিল। সেযুগে প্রথম ইংরাজি শিক্ষার বৈদেশিক ভাবধারা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ

অন্নকরণ-কারী বঙ্গসন্তানগণ এতই আত্মবিস্মৃত ছিল যে, তারা দেশের ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, রীতিনীতি, সংস্কৃতি এমনকি ঈশ্বরকেও অস্বীকার করে এক বিচিত্র গর্ব অন্নভব করত। তখনকার সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোন কোন ঘটনাচিত্রে বাঙ্গালীর এই প্রমত্ততার বিবরণী পাওয়া যায়। যেমন সেকালের হিন্দ্ন কলেজের কোন ছাত্র তার পিতার সঙ্গে কালীঘাটে প্নজা করতে গিয়ে পিতা ও প্নরোহিতের নির্দেশমত—দেবী প্রণাম করেনি, পরে বহ্ন অন্নরোধে ও প্রয়োজনবোধে তিরস্কারে শেষ পর্যন্ত দেবীকে "গ্নড্ মর্ণিং, ম্যাডাম" বলে অভিবাদন করেছিল।

ইংরেজি শিক্ষা ও রীতিপদ্ধতির এর্নপ উৎকট ও হাস্যকর অন্নকরণ-প্রচেষ্টার জন্যই গ্নপ্ত কবির প্রয়োজন হয়েছিল তাঁর লেখনীকে র্নঢ় ব্যঙ্গে শাণিত করতে। কবি শ্নধ্ন যে নকল বাঙ্গালী সাহেবদের ইংরেজিয়ানাকেই ব্যঙ্গ করতেন তা নয়, অন্যদিকে সংস্কৃত শিক্ষাভিমানী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদেরও তাঁদের গোড়ামী আর বঙ্গভাষার প্রতি অবহেলার জন্য "নস্যলোষা" "দধিচোষার" দল বলে ব্যঙ্গ করতেন।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নকল্পে তিনি যেমন ইংরাজিনবীশ দ্বারকানাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধ্ন, রঙ্গলাল, মনোমোহন বস্ন প্রভৃতিকে বঙ্গসাহিত্যের সেবায় দীক্ষিত ও উৎসাহিত করেন, অন্যদিকে তেমনই রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, রামনিধি গ্নপ্ত, রাম বস্ন, নিতাই দাস, হর্ন ঠাকুর প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের রচনাবলী ও জীবনী বহ্ন আয়াসে সংগ্রহ ও প্রকাশিত করে বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধতর ও সংগঠিত করেন। গ্নপ্ত-কবির নিজস্ব সৃষ্টিধারা ও কবিত্বের মধ্যে প্রাচীন কবি রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্রের মতো কোন স্থায়ী

ঐশ্বর্যের নিদর্শন যথেষ্ট না থাকলেও প্রাচীন ও নবীনের এই মিলন সম্পাদন ও বঙ্গসাহিত্যের ক্রমোন্নয়ন, সংগঠনের মধ্যেই বঙ্গ সাহিত্যের প্রতি তাঁর অগাধ অনুরাগ ও শ্রদ্ধা নিহিত রয়েছে।

ঊনিশবৎসর বয়স থেকে শুরু করে আমরণ তিনি সাহিত্যের সেবা করেছেন। "সংবাদ প্রভাকর", "পাষণ্ড পীড়ন", "সাধু রঞ্জন" প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদন ও "হিত প্রভাকর", "প্রবোধ প্রভাকর", "বোধেন্দু বিকাশ" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করে মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন প্রচেষ্টায় জীবন অতিবাহিত করেছেন। অতীতের ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও নবীনের উৎসাহ প্রদান ছাড়াও তিনি বঙ্গভাষার বহুল প্রচারের জন্য দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ, যোগেন্দ্রমোহন, গৌরী-শঙ্কর, ('সংবাদ-ভাস্কর' সম্পাদক) প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে বঙ্গভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রচেষ্টাতেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং "বঙ্গভাষা-প্রকাশিকাসভা", "বঙ্গ-রঞ্জিনী সভা" প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে উদ্যোক্তা ও কর্ণধার ছিলেন। গুপ্ত কবির শিষ্য-গোষ্ঠী মধুসূদন, (যদিও মধুসূদনকে বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির মত একেবারে খাঁটি শিষ্যভুক্ত করা যায় না—তথাপি পূর্বসূরী ও সাহিত্য-পথপ্রদর্শক বা সহায়ক হিসাবে গুপ্ত কবিকে মধুসূদন শ্রদ্ধা জানিয়েছেন) বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু প্রভৃতির যত্নে সেই যুগসন্ধিক্ষণে বঙ্গ সাহিত্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়।

এই ইতিহাসের গুরুত্ব কম নয়। প্রাচীন ধারার অবসান এবং নতুনের সার্থক সূচনা আকস্মিক ব্যাপার নয়। সমুচিত শক্তিমান লেখক ব্যতিরেকে অন্য কারও পক্ষেই এক যুগ থেকে অন্য যুগের সার্থক সংযোজক হওয়া সম্ভব নয়। ঈশ্বর গুপ্ত

ছিলেন সেই মনীষী এবং স্রষ্টা। তাঁর সমবেদনার দিকটিও বিবেচ্য।

গুপ্ত-কবির দেহত্যাগের কিছুকাল পরেই তাঁর স্মৃতি-রক্ষার কোন ব্যবস্থা না দেখে ক্ষুব্ধ কবি মধুসূদন বলেছিলেন :

"......এই ভাবি মনে,—
নাহি কি হে কেহ তব বান্ধবের দলে,
তব চিতা-ভস্মরাশি কুড়ায়ে যতনে,
স্নেহ-শিল্পে গড়ি মঠ, রাখে তার তলে?
আছিলে রাখাল-রাজ কাব্য-ব্রজধামে
জীবে তুমি; নানা খেলা খেলিলা হরষে;
যমুনা হয়েছ পার; তেঁই গোপগ্রামে
সবে কি ভুলিল তোমা?......"

বিশ্ব-সাহিত্য-রস-রসিক কবি মাইকেল মধুসূদনের এই চতুর্দশপদী কবিতাংশটিতে "রাখাল-রাজ কাব্য-ব্রজধামে" কথাগুলির ব্যঞ্জনা, শব্দ-সৌকর্য এবং সর্বোপরি কবির প্রতি কবির শ্রদ্ধানুরক্তির প্রকাশ-সৌষ্ঠব ও বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

গুপ্তকবির মৃত্যুর পর সুদীর্ঘ শতাধিক বৎসর অতীত হয়েছে। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে প্রবাসী-সম্পাদক সুধীপ্রবর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অগ্রণী হয়ে কবির জন্মভিটা কাঞ্চনপল্লীতে (অধুনা কল্যাণীসহর-প্রকল্পের অতিসন্নিকটে) এক স্মৃতিসভার অধিবেশন করেন এবং ঐ সময় তাঁরই চেষ্টায় ঐস্থানে তৎকালীন নদীয়া মহকুমা-হাকিম কর্তৃক একটি স্মৃতিবেদী নির্মিত হয়। সেই ঐতিহাসিক স্মৃতি-বেদীর পরিচয় ফলকে এই পংক্তি কয়টি খোদিত আছে :

"তোমা তরে কাঁদি আজ হে কবীন্দ্র রসরাজ
হাস্যোজ্জ্বল সদা মুক্তপ্রাণ
ব্যঙ্গ কবিতার রঙ্গে একদিন এই বঙ্গে
তুলেছিলে আনন্দ তুফান।
সুধন্য কাঞ্চনপল্লী শ্যামতরু তৃণবল্লী
তব জন্মে ধন্য হেথা মানি,
নহ গুপ্ত হে ঈশ্বর ব্যক্ত তুমি চরাচর
যুগে যুগে সত্য তব বাণী।"*

* প্রবাসী দ্রষ্টব্য।

ঈশ্বরচন্দ্র ও বাংলা সাহিত্য

ভারতচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের সুনিশ্চিত অবসান হয়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে তখন প্রবল বিশৃঙ্খলা, সর্বত্রই পরিবর্তনের মুক্তবায়ুর প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল। ১৭৬০ থেকে শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এই যন্ত্রণার অবস্থা খুবই তীব্র হয়ে ওঠে। এরই মধ্যে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর গেছে, দেশে অরাজকতার বিক্ষোভ ও ত্রাস ঘনীভূত হয়েছে। সে অবস্থায় সুস্থ সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব ছিল না। সাহিত্যের প্রবাহ যুগে যুগে বহতা নদীর মত গতি পরিবর্তন করে। সাহিত্য আর সমাজের ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই মধ্যে মধ্যে সমুদ্রবক্ষে জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় একটা আলোড়ন আসে, এক একজন নবযুগের প্রবর্তকের আবির্ভাব হয়। ইতিহাসের ধারাবাহিকতা বা ক্রমবিকাশের সূত্র ধরে এইসব যুগাবতারদের গমনাগমন নির্ণয় করা সব সময় সহজ নয়, সম্ভবও হয়না। এই যুগসন্ধিকালে আবির্ভাব হয় রামমোহন, রাধাকান্ত, ভবানীচরণ, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার প্রভৃতির এক ধারায়, আর কৃষ্ণমোহন, রাজেন্দ্রলাল, প্যারীচাঁদ, কালীপ্রসন্ন, মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব হয় অপর ধারায়। এই উভয় ধারার মাঝখানে আকস্মিক জলোচ্ছ্বাসের মত আবির্ভাব ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের—এ যেন কতকটা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দুই ধারার মধ্যে সেতু নির্মাণ হল। একটু অনুধাবন করলে দেখা যাবে বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাব তখন অতি প্রয়োজনীয়

হয়ে পড়েছিল। পাহাড়ী পথের চিহ্নপরিচয়হীন ফল্গুধারাকে তিনি অনেকটা নিজের বুক চিরে গঙ্গোত্রীর মত আলো-হাওয়ার রাজ্যে ছেড়ে দিয়েছিলেন বলে মধুসূদন, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথের সাধনা ও সিদ্ধি সম্ভব হয়েছে। ভারতচন্দ্রের পর কবিগান, টপ্পা, পাঁচালী, হাফ্-আকড়াইয়ের খিড়কী-পথে অযত্নলালিত লতাগুল্মের মত বাংলা কবিতার মৃত্যু হতে বসেছিল, ঐশ্বর্যের সমারোহে তাই পেয়েছে সদরের রাজপটে নবজীবন আর মুক্তি। নূতন আর পুরাতনের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে ঈশ্বর গুপ্ত নতুন কালের নবগঙ্গাধরের মত স্বর্গমন্দাকিনীকে ধারণ করে মর্তগঙ্গাকে প্রবাহিত করেছেন।

ঊনিশ শতকের প্রথম পাদে জন্ম গ্রহণ করলেও গুপ্ত-কবি ছিলেন শতাব্দীর মধ্যভাগের মানুষ। এই সময় ভারতের ইতিহাস, বিশেষ করে বাঙ্গালীর জীবনে যে সব ঘটনা দোলা দিয়ে গেছে, তার রেখাপাত তাঁর সাহিত্যেও পাওয়া যায়; যা দুঃখের, তাই মনে বেশি রেখাপাত করে। সেই দিনের বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্তই ছিলেন যুগন্ধর মানব—বাংলা ভাষা যেন তাঁকে আশ্রয় করে সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর দৈবী প্রতিভা, দুর্লভ মনীষা সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে শুনিয়েছিল উজ্জীবনের মন্ত্র। বর্তমানের বাঙ্গালীর আশায়, আকাঙ্ক্ষায়, আনন্দে জাতীয় জাগরণে আমরা যেন গুপ্ত-কবির হৃদয়স্পন্দনটুকুই শুনতে পাচ্ছি। বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবনে বাঙ্গালীর বাংলা সাহিত্যের বিবিধ ক্ষেত্রে, বাঙ্গালীর অধ্যাত্ম-চেতনায় এবং বিস্মৃত মানসলোকে গুপ্ত-কবির ভাবসাধনা ও রূপসাধনার প্রভাব অপরিসীম। বাংলা দেশ সেদিন যেন অনুভব করেছিল দরিদ্র মাতৃভাষাকে মণিদীপ্ত

রত্নাসনে রাজেন্দ্রাণীর গৌরবে অধিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর-এমন এক প্রতিভার আবির্ভাব হয়েছে।

সুতরাং আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় হল, ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর প্রতিভার সহায়তার দ্বারা কি নূতনত্বের সূত্রপাত করেছিলেন, যার ফলে সাহিত্যের মূলগত পরিবর্তন দেখা দিল। এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের দিকে একবার নজর ফেরানো দরকার। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে লৌকিক ধর্মকে আশ্রয় করে কতকটা বৈচিত্র্যহীন ভাবে একই প্রকার রূপকল্পে একই ভাবের অনুবর্তন ঘটেছে। বিষয়বস্তু, দৃষ্টিভঙ্গী, রচনা-পদ্ধতি কোন কিছুতেই কোন কবির স্বাতন্ত্র্য বড় বিশেষ দেখা যায়নি। ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যেই বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম বিষয়-বৈচিত্র্যের সন্ধান মেলে। ভাবের দিক দিয়ে তিনি যদিও সূক্ষ্মতা বা গভীরতার দিকে আগ্রহীও ছিলেন না এবং এসব দিকে যদিও তাঁর সামর্থ্যও ছিলনা, তবু তাঁরই কলমের গুণে বাংলা সাহিত্য মধ্যযুগের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পেরেছিল। ইতিহাসাশ্রয় ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যের আর একটি বড়গুণ—তাঁর পূর্বে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত এবিষয়ে যথেষ্ট ঔদাসীন্য প্রকাশ পেয়েছিল। ভারত-চন্দ্রের মৃত্যুর আগেই পলাশীর যুদ্ধ হয় ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। অথচ পলাশীর যুদ্ধের মত অত বড় এক ঘটনা তাঁর কাব্যে যে কিছু চিহ্ন রেখে যায়নি, তার কারণ কি? সে যাই হোক্, ঈশ্বরচন্দ্রই সর্বপ্রথম সেকালের সমসাময়িক ইতিহাসকে কাব্যে রূপদান করলেন। এছাড়া ইংরেজি ও সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদে, প্রকৃতির বর্ণনায়, অতীত কীর্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শনে, তথ্য ও জীবনী সংগ্রহে তিনি ছিলেন পরবর্তী সাহিত্যিকদের পথ-প্রদর্শক। প্রাচীন কবিদের অপ্রকাশিত ও

লুপ্ত কবিতাবলী এবং তাঁদের জীবনী প্রকাশ করে সমগ্র জাতির তিনি কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। সেগুলি আজও বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। স্বর্গত অক্ষয়চন্দ্র সরকার বলেছেন—"তখন বঙ্গ সাহিত্যের সম্রাট ছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত। তখন কবিতাচর্চার নামই ছিল সাহিত্যচর্চা। এই ঈশ্বর গুপ্ত যখন সম্রাট, তখন বঙ্কিমবাবু নিতান্ত বালক। বালক তখন স্বভাবের সৌন্দর্য উপভোগে অভ্যস্ত হইয়া সাহিত্যের রস-উপভোগে ব্রতী হইয়াছেন। 'প্রভাকরে' পদ্যে লিখিতে লাগিলেন। দীনবন্ধু, দ্বারকানাথ, গোপাল মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, (রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় গুপ্ত কবির ভাব-শিষ্য) বঙ্কিমের মত সকলেই ঈশ্বর গুপ্তের সাকরেদ।"

বঙ্গ সাহিত্যে প্রথম সাপ্তাহিক প্রকাশনার ব্যাপারে ঈশ্বরচন্দ্রই পথপ্রদর্শক। এভাবে দেখলে দেখা যাবে, বঙ্গ সাহিত্যের বিকাশে ঈশ্বর গুপ্তের দান যে কত বিরাট, তা আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেছেন—"বাংলা ভাষার উন্নতি সাধন সম্বন্ধে যে সকল ব্যক্তির গুণকীর্তন করা আমাদের অভ্যাস হয়েছে, তন্মধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের নাম সর্বোচ্চ শ্রেণীতে কীর্তিত হওয়া উচিত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।" এ' প্রসঙ্গে তাঁর ভাষা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন "তাঁহার বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্যে অতুল। যে ভাষায় তিনি পদ্য লিখিয়াছেন, এমন একটি খাঁটি বাংলায় বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষায় আর কেহ পদ্য কি গদ্য কিছু লেখে নাই। ভাষা হেলেনা, টলেনা, বাঁকেনা, সরল সোজা পথে চলিয়া গিয়া পাঠকের মনের ভিতরে প্রবেশ করে। কেবল ভাষা নহে, ভাবও তাই। ঈশ্বর গুপ্ত দেশী কথায় দেশী ভাব প্রকাশ করেন। তাঁহার কবিতায় 'কেলা কা

ফুল' নাই।" বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তিটি আলোচনা প্রসঙ্গে পরে আরেকবার উদ্ধৃত হলেও বক্তব্যের গুরুত্ব হেতু পুনরায় ইহা উদ্ধৃত করলাম। এই ভাবে একটি যুগের উদ্বোধক হিসাবে এবং সাত্যকারের সাহিত্যিক গোষ্ঠী রচয়িতা হিসাবে (এক্ষেত্রেও তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রথম পথিক) ঈশ্বর গুপ্ত ও "সংবাদ প্রভাকরের" স্থান বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রসঙ্গে উক্তিটিও বিশেষ উল্লেখ্য—"এ প্রভাকর ঈশ্বর গুপ্তের অদ্বিতীয় কীর্তি।...একদিন এই প্রভাকরই বাংলা সাহিত্যের হর্তাকর্তা বিধাতা ছিল এবং ঈশ্বর গুপ্তই ছিলেন এই প্রভাকরের প্রভাস্বরূপ"।

গুপ্ত-কবির সময়ে দেশে নীলকরদের অত্যাচার চরমে উঠেছিল। এ-প্রসঙ্গ আগেই বলা হয়েছে। কবি এ বিষয়ের ওপরেও অনেক কবিতা লিখেছেন। আর তাঁরই শিষ্য দীনবন্ধু মিত্রের ঐতিহাসিক "নীলদর্পণ" দেখা দেয় ১৮৬০এ —ঈশ্বরচন্দ্রের তিরোভাবের ঠিক পরের বছর। তাঁর কথা বলতে গেলে আজ সর্বাধিক মনে পড়ে যে, ঈশ্বর গুপ্তই তাঁকে গদ্য রচনায় প্রথম আহ্বান করেন। ঈশ্বর গুপ্তের প্রতিভা-সন্ধানী দৃষ্টি এবং প্রজ্ঞা সেদিন বাংলা সাহিত্যের দ্রুত পরিণতি ও সুষ্ঠু বিকাশের জন্য যে পথ খুলে দেয়, সে কীর্তির গুরুত্ব শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার্য।

ঈশ্বর গুপ্তের কবি-প্রতিভা ও কবি-স্বরূপ

একদিকে নবলব্ধ চেতনার তরঙ্গাঘাত, সৃষ্টি-সম্ভাবনার বেদনায় কাতর হয়ে কখনও কূলে ক্রমে আছড়িয়ে পড়ছে, কখনও দিশারীর অভাবে দিশাহারা,—অপরদিকে যুগসঞ্চিত জ্ঞান-গরিমার বদ্ধ স্রোতে ব্যর্থ জীবনবোধ মৃতকল্প;—বাংলা সাহিত্যের এমনই এক দুর্যোগের দিনে কবি ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাব। সেদিন সাহিত্যাঙ্গনের এক প্রান্তে বদ্ধ বাতায়নের তমসা, অপরদিকে সদ্যোলব্ধ নবালোকের উদ্ধত উচ্ছৃঙ্খল উন্মাদনা বাঙ্গালীর সাহিত্য-প্রীতি এমন কি জীবন-বোধেও বিভ্রান্তি এনে দিচ্ছে। এই রকম দিনেই মুক্তিমন্ত্রের প্রথম উদ্গাতা ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাব!

ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলার সাহিত্য-জগতে কোন প্রতিভা ছিল না, একথা যাঁরা বলেন তাঁদের সঙ্গে আমি একমত নই। একজন কবি বা সাহিত্য-স্রষ্টার সাহিত্যিক জন্মলাভের তাগিদে যে পটভূমিকার প্রয়োজন, যতখানি অনুকূল পরিবেশ থাকা উচিত, তার অস্তিত্বের তেমন অভাব ছিল বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ নেই। কারণ বাংলাদেশের আকাশে বাতাসে প্রকৃতির যে সুর ভেসে বেড়াচ্ছে, তাই যুগে যুগে সৃষ্টিশীল মননশীলতায় ধরা পড়েছে,—সে জন্য বাংলার মনোজগতে কোনদিন সুরের অভাব হয় নি। তাই ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাবের পূর্বযুগেও বাংলার কবিগান, পাঁচালী, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব ও শাক্ত সাহিত্য বাংলার আকাশে বাতাসে সুর ছড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এই সুরের মধ্যে ছিল না

তখন কোন বৈচিত্র্য; বৈচিত্র্যহীনতা ও একঘেয়েমি তখন এই সুরকে অনেকটাই অপ্রিয় করে তুলছিল। বাংলার কাব্য-জগতেও সে যুগে তাই পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল।

অতীতকে স্বীকার করে, ভবিষ্যতের গৌরব বর্তমানকে আলোকিত করবার প্রয়াসে কবি যে প্রগতিশীল নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছেন, তাতে যুগ-সৃষ্টির ঐতিহ্য না থাকলেও সত্য-সৃষ্টির গরিমা ছিল।

By the past, through the present, to the future তিনি তাঁর সত্য সৃষ্টির তরণী বেয়ে রূপসৃষ্টির গান গেয়ে বাংলার জনগণকে চমকিত করেছেন। সেদিনের বাংলার মাঠে-ঘাটে-বাটে যে তরজা আর কবিগান ছড়ানো ছিল, কবি তার প্রসাদ মনের গোপন মণিকোঠায় সঞ্চিত রেখেছিলেন। সে যুগের মঙ্গলকাব্যে, বৈষ্ণবকাব্যে বা সাহিত্যে, যে কথার আলপনা, তার বর্ণালী গ্রহণ করতেও কবি ভোলেননি। দেশ ও জাতির জীবনে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন প্রয়াস তাও কবির অন্তর্নিহিত সত্তায় আঘাত হেনেছে। সেদিনের যুগপ্রয়োজনের তাগিদও কবিকে প্রেরণা দিয়েছে। আর এদের সকলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কবির সহজাত কবি-প্রতিভা। গুপ্ত-কবির কবি-প্রতিভার উন্মেষের ইতিহাস লিখতে বসলে এই কয়েকটি কথা স্মরণে রাখতে হবে। এই হলো মোটামুটিভাবে কবির অন্তর-জগতের ইতিহাস বা চিন্তাজগতের মর্মবাণী। এরাই কবির মনে ফুল ফুটিয়েছে, আগুন জ্বালিয়েছে, এনেছে দীপ্ত বর্ণালী। এরাই জন্ম দিয়েছে সেই প্রতিভার, যে প্রতিভা অতন্দ্র কাব্যসাধনার ইতিহাসে রেখে গেছে দীপ্ত, শাণিত, সত্য-নিষ্ঠার স্বাক্ষর, জ্বলন্ত দেশপ্রেমের বলিষ্ঠ অঙ্গীকার,

দরদী মানবমুখিতা, আর বস্তুনিষ্ঠার সঙ্গে সাবলীল হাস্যরসের অনাবিল প্রবাহ।

সে যুগে একটি সভ্যতা ও সংস্কৃতি আর একটি সভ্যতার দুয়ারে আতিথ্য গ্রহণ করতে চলেছে। প্রাচ্যের সংস্কৃতির দরবারে সেদিন অতীত ঐতিহ্যের ধ্বজাধারীদের পূজা সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে—সেদিন নবীন সমাজ পাশ্চাত্য সভ্যতা আর সংস্কৃতিকে নিজেদের সমাজ জীবনের সম্পূর্ণতায় বরণ করতে উন্মুখ। এরই কুফল স্বরূপ বাঙ্গালীর জীবনে সেদিন পূর্ণাঙ্গ সাহেবিয়ানার নির্লজ্জ প্রতিষ্ঠার ব্যস্ততায় দিগন্ত মুখরিত। যা কিছু বাঙ্গালীর নিজস্ব, তাই ঘৃণ্য, যা কিছু পাশ্চাত্যের, তথাকথিত সম্মানে সম্মানিত, কৃত্রিমতার রঙে রঙিন,—তাই বরেণ্য—এমনই এক সর্বনাশা অবিশ্বাস সেযুগের বাংলা সাহিত্যকে গভীরতর দুর্দিনের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। সেদিনের কাব্যেও অবশ্য বিশিষ্ট ও সংযত রুচিবোধের অভাব ছিল। তেমনই মুক্ত অথচ সত্য, তেমনই বলিষ্ঠ অথচ সংস্কারমুক্ত চিন্তা আর প্রসারিত কল্পনার পরিচয় তৎকালীন কাব্যসাহিত্যে তেমন মেলেনা;—এ অভিযোগ অনেকাংশে সত্য। অনাদৃত অতীত, অবিশ্বস্ত বর্তমান এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সেদিনের বাংলার সাহিত্য-জীবনের এক ভয়াবহ ব্যর্থতা এনে দিচ্ছিল। এমনই সময়ে ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য মঞ্জরিত হল, ছন্দিত হল; কল্লোলিত ও ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে বাংলাদেশ মুখরিত করে তুলল। ক্রমেই সাহিত্যজগতের সেই অবিশ্বাস গেল ঘুচে, ভবিষ্যৎ আবার সম্ভাবনার আলোকে হয়ে উঠল উজ্জ্বল। সংক্ষেপে বলতে গেলে গুপ্ত কবির কবিকৃতির এই হলো পরোক্ষ পটভূমিকা। প্রত্যক্ষভাবে যাঁরা কবির মানসশতদলের প্রতিটি কোরক বিকাশে সহায়তা

করেছেন তাঁরা হচ্ছেন পাথুরিয়াঘাটার যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর[১] এবং আন্দুলের জমিদার জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক[২] প্রভৃতি।

গুপ্ত কবির কবি-প্রতিভার স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যায় যে, তাঁর কাব্যপ্রবাহে মোটামুটিভাবে চারটি স্রোতের মিলন হয়েছে। অধ্যাত্মবাদ, সমাজ ও দেশপ্রেম তথা স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবোধ, বস্তুনিষ্ঠা এবং ইতিহাস-চেতনার চতুর্মুখী প্রবাহ নিয়ে তাঁর কাব্যধারা সাবলীল গতিতে প্রবাহিত হয়েছে। সুতরাং এরূপ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেই তাঁর কবি-প্রতিভার বিচার বিশ্লেষণে এবং কবি-স্বরূপের মূর্তি রচনা ও আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

কবির আধ্যাত্মিক কবিতাগুলির মধ্য দিয়ে বাঙালীর অন্তর্নিহিত সহজ সরল অধ্যাত্মচেতনাই নবরূপে বিকশিত হয়েছে। এই কবিতাগুলির সঙ্গে সাধক-কবি রামপ্রসাদের রচিত শাক্ত কবিতাগুলির তুলনা করা চলে। তবে রাম-প্রসাদের কবিতায় নিবিড় আকৃতি ও দুঃখবাদের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। এর তত্ত্বমূল্য অপেক্ষা অন্তরানুভূতিই গভীরতর। কিন্তু গুপ্ত-কবির সহজ সরল অনুপ্রাসের অন্তরালে সত্য ও তত্ত্বের জ্ঞানগর্ভ সমৃদ্ধি রয়েছে। গুপ্ত-কবি প্রধানত পিতৃভাবের উপাসক, আর রামপ্রসাদ হলেন মাতৃ-ভাবের—মাতৃ সাধনার পূজারী। কবি ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর ধর্ম-সম্বন্ধীয় কবিতায় কিরূপ সহজ ও সরল ভাষায় গভীর তত্ত্ব

[১] পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র নন্দকুমারের জ্যেষ্ঠপুত্র। ইনিই কবির কাব্য-জীবনের প্রভাত-সঙ্গী। 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশের প্রধান উৎসাহদাতা।

[২] আন্দুলের জমিদার জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক রত্নাবলী নামক পত্রিকা প্রকাশ করেন। মহেশ পাল ছিলেন ইহার সম্পাদক। কিন্তু তাঁহার অসুস্থতা নিবন্ধন কবিকেই সম্পাদনা করতে হয়।

পরিবেশন করেছেন তার নিদর্শন স্বরূপ কয়েকটি উদ্ধৃত করা হল :

ফুটে না বলিতে পার, ভঙ্গি করে কও।
ওরে বাবা আত্মারাম, হাবা কেন হও॥
যেরূপ জানাতে হয়, সেরূপে জানাও।
যেরূপে মানাতে হয়, সেরূপে মানাও॥

কবি ঈশ্বরকে নিজের অন্তরস্থ পরমপুরুষকেই বলেছেন 'আত্মারাম'; এই 'আত্মারাম' যদি 'হাবা' অর্থাৎ স্থবির বা বোকা হন, তাহলে জগৎ সংসারের এই লীলারহস্যের উৎস কিরূপে সংস্থিতি পাবে। কবি সেই অবাঙ্মানসগোচর ঈশ্বরের উপস্থিতি বা অস্তিত্ব নিজের আত্মায় অনুভব করছেন। সেই আত্মার বা ঈশ্বরের ভাষাকে ভাবের রূপে গ্রহণ করতে, রূপ-ময়কে অরূপের অবগুণ্ঠন থেকে প্রকাশ করতে কবির তাই এই নিবিড় আকুতি। জীব ও শিবের সম্বন্ধ নির্ণয় করতে বসেও কবির বাগ্‌বৈদগ্ধ্য পরাজয় স্বীকার করেনি। সেখানেও ভাষার প্রাঞ্জলতা ভাবকে স্বচ্ছতায় বরণ করেছে।

কবির তত্ত্ব শীর্ষক কবিতায় ইহা প্রমাণিত—

"'আমি' যদি 'তুমি' হই, আমার বিনাশ কই?
এ কথাটি কারে কই, কে বলে আমায়?
ছিল শিব, হল জীব, আছি জীব হব শিব
এইরূপ জীব শিব, আমায় তোমায়॥"

এমনই বলিষ্ঠ অথচ সরল ভাষায় জীবাত্মার অবিনাশী তত্ত্বের স্বরূপ বিশ্লেষণ তৎকালীন কাব্যদর্শনের ইতিহাসে দেখা যায় না। এ-স্থলে ঈশ্বরচন্দ্র যথার্থ কবি, তাত্ত্বিক, দার্শনিক এবং সাধক। এমনি করে অবিনশ্বর আত্মার জয়গান গাইতে, জীব ও শিবের মিলনতত্ত্ব পরিবেশন করতে কোন কবি

সেদিন এগিয়ে আসেননি। সাহিত্যে দেব-মহিমা কীর্তন মনুষ্যত্বের সরল অথচ দৃঢ় আশা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই হলো প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ। কবির সামাজিক ও দেশপ্রেমের কবিতা-গুলিকে বুঝতে হলে তৎকালীন সামাজিক পরিবেশ ও রীতিনীতির সঙ্গে পরিচয় প্রয়োজন। ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যে অতীত ও বর্তমান হাত ধরাধরি করে চলেছে। সে যুগের পাশ্চাত্যানুরাগের বাহুল্যকে কবি ভাল চোখে দেখেননি। স্বভাবতঃ স্বজাতি-প্রীতি ও স্বদেশ-নিষ্ঠা কবিকে তৎকালীন ইঙ্গ-বঙ্গসমাজকে আঘাত হানতে প্রেরণা দিয়েছে। তাই পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ-প্রিয়তার বিরুদ্ধে তাঁর দীপ্ত লেখনী শাণিত হয়েছে। যারা নির্লজ্জ সাহেব-প্রীতির প্লাবনে দিশেহারা হয়ে স্বধর্ম ভুলেছে, তাদের বিদ্রূপ করে কবি বলেছেন :

গোরার দঙ্গলে গিয়া কথা কহ হেসে
ঠেস মেরে বস গিয়া বিবিদের ঘেঁসে
রাঙা মুখ দেখ বাবা টেনে লও 'হ্যাম্'
'ডোন্ট্ক্যার হিন্দুয়ানী' 'ড্যাম্ ড্যাম্ ড্যাম্'।

যে আচার-সর্বস্ব গোঁড়ামি তৎকালীন বাঙালী সমাজে সর্বনাশা দুর্বলতা এনে দিয়েছিল, তাকে কবি ক্ষমা করেননি। তাই কৌলীন্যের তথাকথিত গোঁড়ামির বিরুদ্ধে কবি ক্ষুরধার লেখনী চালনা করেছেন:—

মিছে কেন কুল নিয়া কর আঁটা-আঁটি।
এ যে কুল, কুল নয়, সারমাত্র আঁটি॥
কুলের গৌরব কর, কোন্ অভিমানে।
মূলের হইলে দোষ, কেবা তারে মানে॥

অতীত ঐতিহ্যের ধ্বজাবাহী 'ভাস্কর' পত্রিকাকেও কবি

তাই ক্ষমা করতে পারেননি। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যকে[৩] 'গুড়-গুড়ে ভটচাজ' নামে অভিহিত করে তাঁর সঙ্গে দ্বন্দ্বে নেমেছিলেন। তৎকালীন ভদ্র-সমাজের তথাকথিত বেপরোয়া ব্যবহারে আদর্শবাদী কবির যেন ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। কবি তারই স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন:—

ভদ্রকুলে জন্ম লই, ভদ্র নই নিজে।
যবনের সম সদা, জ্ঞান করি দ্বিজে॥
ভদ্র কর্ম কারে কহে, কিছু নাহি জানি।
ধর্মাধর্ম পুণ্য পাপ, কিছু নাহি মানি॥

মেকী বিদেশীপনা বা বিদেশিয়ানার বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র তীক্ষ্ন বিদ্রূপের অন্তরালে আছে গভীর জ্বলন্ত দেশপ্রেম। স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বভাষার সর্বস্ব, কবি তাঁর অন্তর উজাড় করে দিয়ে ভালবেসেছেন—তাই দেশের দুর্দশায়, বঙ্গ-ভাষার অবমাননায়, জাতির অসম্মানে কবি-হৃদয়ের যে ক্ষোভ তা' কখনো অশ্রুসিক্ত বেদনায় করুণ সুরে ধ্বনিত হয়েছে, কখনো দেশদ্রোহী, জাতিদ্রোহীর বিরুদ্ধে অগ্নিবর্ষণ করেছে। তাই শুধুমাত্র ব্যঙ্গবিদ্রূপের কশাঘাতে কাতর পাঠকের বরণীয় মহান সান্ত্বনা এই যে, এই বিদ্রূপ কবিমানসের গভীরতম দেশ-প্রেমের ফল্গুধারা থেকে উৎসারিত। কবি বঙ্গ-ভাষার মহিমা কীর্তনে যেরূপ পঞ্চমুখ, স্বদেশের ও স্বজাতির গরিমা গাথা ঘোষণায় সেরূপ সোচ্চার। মুখর ও নির্ভীক কবিকণ্ঠ কখনও এই প্রচেষ্টায় মন্থর বা নীরব হয়নি। কবির দেশানু-

[৩] গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য—'ভাস্কর' পত্রিকার সম্পাদক। কবি এই 'ভাস্কর' পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গী ও আদর্শের সঙ্গে একমত হতে না পারায় 'পাষণ্ড পীড়ন' নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। কিন্তু কুৎসা ও নিন্দারস একে মাত্রাতিরিক্ত প্রভাবান্বিত করায় পত্রিকাটি কালে জনপ্রিয়তা হারিয়ে উঠে যায়।

রাগের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন হলো বহুশ্রুত কবির 'জন্মভূমি' কবিতাটি। নিজের দেশের ভাষার প্রশংসা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন:—

যে ভাষায় হয়ে প্রীত পরমেশ গুণ গীত
বৃদ্ধকালে গান কর মুখে,
মাতৃসম মাতৃভাষা পুরালে তোমার আশা
তুমি তার সেবা কর সুখে।

দেশের দুর্দশায় কবির অকৃত্রিম অনুভূতি যেরূপ সরল, সুন্দর ছন্দে রূপায়িত হয়েছে, তাতে যে কোন দেশদ্রোহীকেও চঞ্চল করবে:—

মনেতে জেনেছি সার আমাদের ভাগ্যে আর
পোহাবে না দুঃখের যামিনী।
অতএব বাক্য ধর বৃথা বিলম্ব কর
হও মাগো পাতাল গামিনী॥
আমরা তোমার সহ নাগপুরে অহরহ
গুপ্তভাবে ঘুচাইব দুঃখ।[৪]

শাসনকর্তাদের প্রতি কবির বক্রদৃষ্টি মাঝে মাঝে তাঁর লেখনীকেও বক্র করেছে। তৎকালীন শাসনকর্তা লর্ড ডালহৌসীর মহিমা কীর্তনের উত্তরে তিনি তাঁর স্বভাব সুলভ কৌতুকপ্রিয়তায় মুখর হয়ে উঠেন। তাঁর প্রগল্‌ভ লেখনী রচনা করে:—

ডালে 'হাউস' যার সেই যে গো বানর
সেই যে 'গভর্ণর'।[৫]

সেকালের রাজনৈতিক ইতিহাসের পৃষ্ঠায় কবি তাঁর

[৪] 'সংবাদ প্রভাকর', ১লা বৈশাখ, ১২৫৫।
[৫] পাষণ্ড পীড়ন,—ভাদ্র, ১২৫১।

ছন্দোবদ্ধ স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁর যুদ্ধ বিষয়ক কবিতাগুলির মধ্য দিয়ে। 'সিপাহীবিদ্রোহ' এবং 'নানাসাহেব' শীর্ষক কবিতায় ভাবের ও চিন্তাধারার অস্পষ্টতার লক্ষণ থাকলেও 'শিখযুদ্ধ' 'মুদ্‌কির যুদ্ধ' কানপুরের যুদ্ধ' 'দিল্লীর যুদ্ধ' 'এলাহাবাদের যুদ্ধ' 'কাবুলের যুদ্ধ' (১২৪৮) প্রভৃতি কবিতাগুলি কবির ইতিহাস-নিষ্ঠা ও ইতিহাস-জ্ঞানের পরিচয় বহন করে। কবির বস্তুনিষ্ঠার কথাও বিশেষ উল্লেখ্য। কেননা, গুপ্ত-কবিই বাংলা কাব্যের নূতন দিগন্তের দিশারী। অধ্যাত্ম-কাহিনী ও পুরাণ-সর্বস্ব কাব্যকে জীবনের বিস্তৃত পট-ভূমিকায় টেনে এনে কাব্য-পরিধিকেও প্রসারিত অঙ্গনে মুক্ত পরিবেশে প্রতিষ্ঠা করার যে অতুলনীয় কৃতিত্ব ও সম্মান, তা' গুপ্ত-কবিরই সর্বাংশে প্রাপ্য। 'আনারস' 'তপসে মাছ' 'পাঁঠা' প্রভৃতি নিয়ে যে কবিতা রচিত হতে পারে, এটা তাঁর পূর্ববর্তী কবিগণের কল্পনাতীত ছিল। তাই ভাবের ও সুরের এক-ঘেয়েমি সেযুগের পাশ্চাত্যের নবালোকমুগ্ধ বাঙ্গালী মনকে কাব্যবিমুখ করে তুলেছিল। শুধুমাত্র কাল্পনিক উপাখ্যানের ফেনোচ্ছ্বাস বুদ্ধিনিষ্ঠ ও বাস্তবাগ্রহী কাব্য-পাঠকদের মন আকর্ষণ করতে পারেনি। কবিবর ঈশ্বর গুপ্তই কবিতা সরস্বতীকে সে অভিশপ্ত বন্দীত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছেন— "জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে।" জীবনের ক্ষুদ্র তুচ্ছ নগণ্য তথ্য বা বিষয় থেকে জীবনোত্তর তত্ত্ব পর্যন্ত তাঁর ছন্দের তরণী বেয়ে তিনি বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে কাব্যের পসরা পৌঁছিয়ে দিয়েছেন; বাঙ্গালী জাতি তাই তাঁর কাছে চিরদিনের জন্য ঋণী। আমরা এখানে কবি ঈশ্বরচন্দ্রের কবি-প্রতিভা ও কবি-স্বরূপের বিচার বিশ্লেষণ ও আলোচনা করতে বসেছি। এই আলোচনার যিনি পথিকৃৎ অর্থাৎ যিনি কবি ঈশ্বরচন্দ্রের কাব্য-

সাধনা ও প্রতিভার বিষয়ে প্রথম লিপিবদ্ধ করে বিশদভাবে রসিকের কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা উৎপাদন করেছেন, সেই বঙ্গ-সাহিত্য-ভগীরথ বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ কয়েকটি উক্তিকে বর্তমান আলোচনার প্রেরণা হিসেবে উদ্ধৃতির সাহায্যে পুনরায় স্মরণ করবার লোভ সংবরণ করা সত্যিই দুরূহ। কবির জীবন ও কাব্য-সাধনার ভূমিকা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন : (সংবাদ) "প্রভাকর" ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অদ্বিতীয় কীর্তি। বাংলা সাহিত্য এই প্রভাকরের নিকট বিশেষ ঋণী। মহাজন মরিয়া গেলে খাতক আর বড় তার নাম করে না। ঈশ্বর গুপ্ত গিয়াছেন আমরা আর সে ঋণের কথা বড় একটা মুখে আনি না। কিন্তু একদিন প্রভাকর বাঙ্গালা সাহিত্যের হর্তা কর্তা বিধাতা ছিল। প্রভাকর বাংলা রচনা রীতিও অনেক পরিবর্তন করিয়া যায়। ভারতচন্দ্রী ধরণটা তাহার অনেক ছিল বটে, অনেক স্থলে সে ভারতচন্দ্রের অনুগামী-মাত্র, কিন্তু আর একটা ধরণ ছিল, যা কখন বাঙ্গালা ভাষায় ছিল না, যাহা পাইয়া আজ বাঙ্গালার ভাষা তেজস্বিনী হইয়াছে। নিত্যনৈমিত্তিকের ব্যাপার, রাজকীয় ঘটনা, সামাজিক ঘটনা, এ সকল যে রসময়ী রচনার বিষয় হইতে পারে, ইহা প্রভাকরই প্রথম দেখায়। আজ শিখের যুদ্ধ, কাল পৌষপার্বণ, আজ মিশনারী, কাল উমেদারি, এ সকল যে সাহিত্যের অধীন, সাহিত্যের সামগ্রী, তাহা প্রভাকরই দেখাইয়াছিল।................. ভারতবর্ষের দেশীয় সংবাদপত্রের মধ্যে এই প্রভাকরই প্রথম প্রাত্যহিক।" কবি ঈশ্বর গুপ্তের এটাও এক অপূর্ব কৃতিত্বের পরিচায়ক। কবির অন্যান্য বিশেষ কৃতিত্বের মধ্যে, সাহিত্য-কীর্তির মধ্যে—প্রাচীন কবিদের অপ্রকাশিত লুপ্তপ্রায় কবিতাবলী, গীত, পদাবলী এবং তাঁদের জীবনী উদ্ধার ও

প্রকাশ করা, বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এই উদ্দেশ্যে কবি ক্রমাগত দশ বছর নানা স্থান ঘুরে এবং প্রভূত শ্রম স্বীকার করে এ বিষয়ে সাফল্য অর্জন করেছেন। বাঙালী জাতির মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রই এবিষয়ে প্রথম উদ্যোগী এবং পথপ্রদর্শক। পরবর্তী যুগে এই উৎসাহ ও কৌতূহল, জিজ্ঞাসা এবং গবেষণার তোরণ উন্মোচিত করে তাকেই বিবিধ ভূষণে সুশোভিত করে চলেছে। বাঙালী জিজ্ঞাসু ও উদ্যোগী বাংলা-সাহিত্যের গবেষকদের কাছে কবি ঈশ্বর গুপ্ত তাই চির নমস্য ও চিরস্মরণীয়। পরবর্তী যুগে বাংলা সাহিত্যের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনারও এক প্রারম্ভিক পটভূমিকা ও তার উদ্যোগ প্রচেষ্টার ভিত্তি রচনা কবি ঈশ্বর গুপ্ত প্রথমে করে গিয়েছেন বললে বোধ করি অত্যুক্তি হবে না। ঈশ্বরচন্দ্রের কবিত্বের বিচার প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন:—"...যাহা আদর্শ, যাহা কমনীয়, যাহা আকাঙ্ক্ষিত, তাহা কবির সামগ্রী। কিন্তু যাহা প্রকৃত, যাহা প্রত্যক্ষ, যাহা প্রাপ্ত, তাহাই বা নয় কেন? তাহাতে কি কিছু রস নাই? কিছু সৌন্দর্য নাই? আছে বৈকি। ঈশ্বর গুপ্ত সেই রসে রসিক, সেই সৌন্দর্যের কবি। যাহা আছে, ঈশ্বর গুপ্ত তাহার কবি। তিনি এই বাঙ্গালা সমাজের কবি। তিনি কলিকাতা শহরের কবি, তিনি বাঙ্গালার গ্রাম্যদেশের কবি।" আমরা কবির পরিহাসরসিকতার কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তিনি ছিলেন জীবন রসিক কবি। কাজেই সাধারণ মানুষ যেখানে দুঃখে কাতর হয়ে পড়ে, হতাশ হয়ে সব হাল ছেড়ে দেয়, কবি সেখানে নোঙর ফেলে দিব্যি নিশ্চিন্তে বসে থাকেন; সাধারণ কবি দুর্ভিক্ষের দিনে বা অভাবে দুঃখে জর্জরিত মাতা বা শিশুর চোখের অশ্রুবিন্দুকে মুক্তাহারের সঙ্গে উপমা দিয়ে থাকবেন,—সেখানে কবি চালের

দরটি কষে দেখে তার ভিতর থেকেও একটু রস আহরণ করেন:—

মনের চেলে মন ভেঙেগচে
ভাঙগা মন আর গড়ে নাকো।

সাধারণ কবিরা যেখানে রমণীর রমণীয় কমনীয়তায়, লীলায়িত দেহবল্লরীর ছন্দিত সুষমায় বিমোহিত হয়ে সেই তন্বীর তনুশ্রীর বন্দনা বা স্তুতিতে কবিতা রচনা করেন, কবি সেখানে সেই যৌবনমদমত্তা বিলাসিনীদের রান্নাঘরে, উনুন গোড়ায় বসিয়ে, শাশুড়ী ননদের গঞ্জনায় ফেলে, 'সত্যের সংসারের একরকম খাঁটি কাব্য রস' প্রকাশ করেন:—

বধুর মধুর খনি, মুখ শতদল।
সলিলে ভাসিয়া যায়, চক্ষু ছলছল॥

ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে এই সাধারণ নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়গুলি; যেগুলিকে আমরা তেমন বিশেষ মূল্য দিইনি এতদিন (ঈশ্বর গুপ্তের পূর্ব যুগ পর্যন্ত)। ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য তাই 'চালের কাঁটায়, রান্নাঘরের ধুঁয়ায়, নাটুরে মাঝির ধ্বজির ঠেলায়, নীলের দাদনে, হোটেলের খানায়, পাঁঠার অস্থিস্থিত মজ্জায়।' তিনি 'আনারসে' মধুররসের সঙেগ কাব্যরসও আস্বাদন করেন, 'তপসে মাছে' মৎস্যভাব ছাড়াও দেখেন তপস্বীভাব, 'পাঁঠার' বোকাগন্ধ ছাড়াও তার গায়ের গন্ধে পান একটু দধীচির গায়ের গন্ধ! কবির কথায়—'এত ভঙগ বঙগদেশ তবু রঙগভরা!' মানব-জীবনের সাধারণ বিষয়গুলির মধ্যে এমনি কৌতুক, এমনি রঙগই খুঁজে পেয়েছেন, আর তাকেই তিনি অপরূপ সহজ বাগ্‌ভঙগীর সাহায্যে বাণীময় করে তুলেছেন। 'স্থূল কথা, ঈশ্বর গুপ্ত Realist এবং ঈশ্বর গুপ্ত satirist; ইহা

তাঁহার সাম্রাজ্য এবং ইহাতে তিনি বাঙগালা সাহিত্যে অদ্বিতীয়।' 'নীহার-শীতল স্বচ্ছ সলিলধৌত কষিতকান্তি' রমণীয় দেহসৌন্দর্যের প্রতি পরিহাসরসিকতা বা কৌতুক-প্রিয়তা এক্ষেত্রে লক্ষণীয়:—

সিন্দুরের বিন্দুসহ কপালেতে উল্কি।
নসী, জশী, ক্ষেমী, বামী, রামী শ্যামী গুল্‌কী॥

বলাবাহুল্য, কবির নামকরণের চাতুর্য এখানে আরো বেশী আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। পূর্বেই বলেছি কবি সেকালের নব্য-বাঙগালী যারা উৎকট সাহেবিয়ানার অন্ধ অনুকরণ করে আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করছিল, কবি তাদের প্রতি লক্ষ্য করে তীব্র বিদ্রূপ বা ব্যঙগবাণ নিক্ষেপ করেছেন তাঁর রচনায়। মহারাণীকে স্তুতি করতে গিয়ে দেশী Agitator-দের তীব্র সমালোচনা ও নিন্দা করেছেন:—

তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গরু,
শিখিনি সিং বাঁকানো,
কেবল খাব খোল বিচালি ঘাস।
যেন রাঙগা আমলা, তুলে মামলা,
গামলা ভাঙেগ না।
আমরা ভূসি পেলেই খুসী হব,
ঘুসি খেলে বাঁচব না॥ (নীলকর)

সাহেব-বাবুদের কবি রীতিমত নিন্দাভাজন জ্ঞান করেছেন এবং বিদ্রূপতীক্ষ্ম ভাষায় লিখেছেন:—

যখন আসবে শমন করবে দমন
কি বোলে তায় বুঝাইবে।
বুঝি হুট্ বোলে বুট পায়ে দিয়ে
চুরুট ফুকে স্বর্গে যাবে॥

উপরের দুইটি কবিতার অংশবিশেষ পূর্বে আলোচনা-প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হয়েছে, তবুও নিতান্ত কাব্যসৌন্দর্য ও বক্তব্যের পরিস্ফুটনের সহায়ক হিসেবে কবিতাংশগুলির যথাসম্ভব সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি আবার লিপিবদ্ধ হয়েছে।[৬] পাশ্চাত্য উগ্র সাহেবিয়ানা কবিকে অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্মাহত করেছিল। বিশেষ করে যখন বঙ্গযুবকগণ এই সাহেবিয়ানা অনুকরণের ঘৃণ্য প্রচেষ্টায় নিজেদের নিয়োজিত করতে লাগল, কবি অধৈর্য হয়ে উঠলেন; ব্যঙ্গের সুনিপুণ শব্দগ্রন্থিতে ও অনুপ্রাসের আন্দোলনে সেই সাহেবি নৃত্য-গীতের একটি কৌতুকপূর্ণ চিত্র বাণীবন্ধ করেছেন:—

গুড়ু গুড়ু গুম গুম লাফে লাফে তাল।
তারা রারা রারা রারা লালা লালা লাল॥

উক্ত নৃত্য-গীতে যে ছন্দ, তাল বা কোন শিল্প সুষমা ও দর্শনীয় সৌষ্ঠব কিছুই ছিল না, কবির শব্দ-প্রয়োগ-লালিত্যে তা অপূর্ব রূপায়িত হয়েছে। সখের বাবুদের যে হাস্যকর অদ্ভুত চিত্র প্রমূর্ত করেছেন তা কবির রসবোধ, কৌতুক-প্রিয়তা, বাস্তবানুভূতি এবং অপূর্ব ব্যঙ্গরসের পরিচয় বহন করছে। বিনা সম্বলে সখের বাবু নিতান্ত অনুকরণপ্রিয় হলে যে অবস্থা হয়, এখানে তারই রসগ্রাহী বর্ণনা দিয়েছেন কবি :—

"তেড়া হোয়ে তুড়ি মেরে, টপ্পা গীত গেয়ে।
গোচ গাচে বাবু হন, পচাশাল চেয়ে॥
কোনরূপে পিত্তিরক্ষা, এটোকাঁটা খেয়ে।
শুদ্ধ হন ধেনো গাঙ্গে, বেনো জলে নেয়ে॥"

---

৬ ২৩শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এই বর্ণনাটিতে শুধু যে সখের বাবুদের (বিনাসম্বলে) অবস্থাচিত্রণ রয়েছে, তা নয়; এতে সেকালের অল্প বা মধ্য-শিক্ষিত এমনকি উচ্চ-শিক্ষিত নব্য সাহেব বাঙ্গালী বাবুদের একটা সামাজিক অবস্থা, সমাজে অধঃপতন বা অবনতির যে প্রারম্ভ সূত্র এদের আচরণের মধ্য দিয়ে ক্রমশ যুবসমাজ ও যুবমনকে বিষাক্ত ও বিপথগামী করছিল তারও কিছু উপাদান-ভিত্তিক চিত্রও যেন উঁকি দিচ্ছে। বস্তুত কবির তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তি ও বাস্তববোধ কবিকে এমন উৎকট চিত্র-চিত্রণে বিশেষ সাহায্য করেছে, আর প্রণোদিত করেছে প্রজ্বলন্ত দেশপ্রেম ও স্বাজাত্য-প্রীতি। এই স্বদেশ-সংস্কৃতি-প্রীতির বশে কবি সেযুগের প্রথম মেয়েদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলনে দেশে এক মহাচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলেও, তাকে ভাল চোখে মেনে নিতে পারেননি। যদিও বিষয়টির গুরুত্ব যথেষ্ট, কিন্তু কবি তাকে রচনায় কিছুটা হাল্কা করে এই ব্যবস্থার উদ্যোগীদের আঘাত না করে পরিহাস করেছেন বেশি। নিচের উদ্ধৃতিটি লক্ষণীয়:—

আগে মেয়েগুলো ছিল ভাল
ব্রত ধর্ম করতো সবে।
একা বেথুন এসে শেষ করেছে
আর কি তাদের তেমন পাবে?
যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে
কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে।
তখন 'এ' 'বি' শিখে বিবি সেজে
বিলাতী বোল কবেই কবে। (দুর্ভিক্ষ)

উদ্ধৃত অংশটিতে কবির পরিহাসপ্রিয়তার সঙ্গে বাস্তব-বোধ এবং দূরদর্শিতাও কেমন সুন্দর প্রকাশিত হয়েছে। এই

সময়ের ভারতের ইতিহাসে ও বাঙালীর জীবনে যে সব উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে, সেরকম অনেক ঘটনারই প্রতিফলন দেখা যায় তাঁর রচনায়। এসব কথা আগেই বলা হয়েছে। বিশদতর উল্লেখের জন্যে দুএকটি কথা পুনরপি স্মরণীয়।

সেকালে নীলকরদের অত্যাচার একটা আতঙ্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কোম্পানীর আমলে ইংরেজরা বাংলাদেশে নীল চাষ করতে আরম্ভ করেন। এখনও তার নিদর্শনরূপে নানা জায়গায় অনেক প্রাচীন নীলকুঠি দেখতে পাওয়া যায়। বলপূর্বক গরীবদের জমি হরণ, চাষীকে জোর করে বেগার খাটান, কেউ বাধা দিলে তার প্রতি অত্যাচার করা,—সেকালের নীলকর সাহেবদের রীতিতে দাঁড়িয়েছিল। সেযুগের অসহায় সাধারণ মানুষ মূক প্রতিবাদ ছাড়া আর কিছুই করতে পারত না। কবি ঈশ্বর গুপ্ত ইংরেজদের এই জঘন্য বর্বর ব্যবহারে অত্যন্ত বেদনাহত ও ক্ষুব্ধ হয়ে শাণিত লেখনী ধারণ করেন। নীলকরদের অত্যাচার তখন সাধারণের সহ্যের বাইরে, তার উপর তাদেরই অর্থাৎ সেই অত্যাচারী বর্বরদেরই নাকি করা হবে 'অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট'—এমনি এক নির্দেশ এল। ভিক্টোরিয়া তখন এ দেশ শাসন করছেন। কবি তাঁকে নীলকরদের অত্যাচার স্বচক্ষে এদেশে এসে দেখে যাবার জন্য কবিতার মাধ্যমেই অনুরোধ জানান:—

কোথা রইলে মা ভিক্টোরিয়া মাগো
কাতরে কর করুণা,
'আসিয়া' আসিয়া মাগো করুণাময়ী
করুণা চক্ষে দেখনা। (নীলকর)

যে অত্যাচারী হয়, সাধারণতঃ তার হাতে ক্ষমতা গেলে

৪

তার অত্যাচার বাড়ে বৈ ত কমে না। তাই আবেদনে যুক্তি দিয়ে লিখলেন:—

হ'লে ভক্ষকেতে রক্ষাকর্তা ঘটে সর্বনাশ,
কালসাপ কি কোনোকালে দয়াতে ভেকে পালে?
টপাটপ অমনি করে গ্রাস। (নীলকর)

কি অনবদ্য উপমা ও যুক্তিজ্ঞান, কেমন সুন্দর প্রকাশ-ভঙ্গী! সে-যুগে নতুনের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে প্রাচীন অনেক সময় তার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে পাচ্ছে না, সেকালে নতুনই অনেক ক্ষেত্রে পাচ্ছে বরমাল্য। মিশনারীদের সংস্পর্শে এসে তখন অনেকে ধর্মান্তর গ্রহণ করতেও কুণ্ঠাবোধ করছে না। কবির চোখে এটি অত্যন্ত অশোভন এবং অন্যায় মনে হয়েছে। তাই তিনি সর্বধর্মই যে সমান, এবং ধর্মান্তর গ্রহণের যে কোন প্রয়োজন নেই, এই যুক্তি দেখিয়েছেন তাঁর নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটিতে:—

পরমেশ কৃপাময় এক ভিন্ন দুই নয়
সবার উপাস্য হল যিনি।
শ্বেত পীত কৃষ্ণবর্ণ নরনারী যতবর্ণ
সকলের ত্রাণকর্তা তিনি।

জুস জাতি সুনিপুণ তারা জানে ঈশগুণ
কোরাণে যবন নাশে খেদ।
তোমাদের বাইবেলে তোমাদেরি মুখ মেলে
আমাদের শিরোধার্য বেদ। (মিশনারী)

এতে একদিকে যেমন সর্বধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি স্বধর্মের প্রতি সুগভীর নিষ্ঠা এবং শ্রদ্ধাও প্রকাশিত। পরবর্তী উদ্ধৃতিতে শুধু গভীর সুরে কথা বলা

হয়নি, বরং ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণশরে জর্জরিত করেছেন মিশনারীকে রাঙারঙের সাপের সঙ্গে তুলনা করে :

মিশনারী রাঙ্গানাগ দংশে ভাই যারে
একেবারে বিষদাঁতে মেরে ফেলে তারে।

*　　　*　　　*

বিদ্যাদান ছল করি মিশনারী ডব
পাতিয়াছে ভাল এক বিধর্মের টব।

(ছদ্ম মিশনারী)

বস্তুত সে সময়ে বহু মিশনারীকেই দেখা যেত সরলমতি, দুঃস্থ জনসাধারণকে অর্থ বা চাকরির লোভ দেখিয়ে কৌশলে ধর্মান্তরিত করতে। খৃষ্টান মিশনারীদের এইরকম হীন প্রবৃত্তি বা মনোবৃত্তিকে কবি মোটেই সহ্য করতে পারেননি, আর তারই ফলে ঈশ্বর গুপ্তের এই ব্যঙ্গের শায়ক নিক্ষেপ। প্রাচীনপন্থী ও সংস্কারপন্থীদের দ্বন্দ্বে সেকালের সমাজ-জীবনের সব থেকে বেশি আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা হলো,—বিধবাবিবাহ-আন্দোলন এবং সরকার কর্তৃক ব্যাপারটির বৈধ-করণ ব্যবস্থা। কবি ঈশ্বরচন্দ্র এই ব্যবস্থায় অনুমোদন দেননি, তারই বিরুদ্ধে মত জানিয়ে তিনি অনেকগুলি কবিতা লিখেছেন। কিন্তু এখানেও তাঁর কবিতার প্রধান সুর ব্যঙ্গ বা পরিহাস। সেই পরিহাস কখনও বিধবার প্রতি, কখনও বা বিধবা বিবাহ আইনের কর্ণধার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে লক্ষ্য করে স্ফুরিত হয়েছে :—

বাধিয়াছে দলাদলি লাগিয়াছে গোল
বিধবার বিয়ে হবে বাজিয়াছে ঢোল। (বিধবা বিবাহ)

তারপর এই বিধবা বিবাহ হ'লে পরবর্তী অধ্যায়ে যে কি হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তারই সরস অপূর্ব

বাণীমূর্তি এই দুই লাইন :—

বুকে ছেলে কাঁকে ছেলে, ছেলে কোলে ঝোলে
তার বিয়ে বিধি নয় উলু উলু বলে। (ঐ)

বিদ্যাসাগর সম্বন্ধেও ব্যঙ্গ করতে কবি দ্বিধা করেননি। যা সত্য এবং ন্যায় বুঝেছেন তাকেই নির্ভীক ভাষামণ্ডিত রূপ দিয়েছেন। কবির মতে এই বিধবা-বিবাহ তাদের কোন উপকার করেনি, বরং অনেকটা কৌলীন্যই নষ্ট করেছে :—

অগাধ বিদ্যার বিদ্যাসাগর
তরঙ্গ তায় রঙ্গ নানা
তাতে বিধবাদের কুল তরী
অকূলেতে কুল পেলনা॥ (দুর্ভিক্ষ)

কোম্পানী আমলে অনেক ইংরেজ পরিবার কলকাতায় বাস করতেন। তাঁদের নিয়ে যে একটা আলাদা পাড়া গড়ে উঠেছিল, ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যে তারও রূপ দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের থেকে তাদের আচার-আচরণ, জীবনযাত্রার রীতি, চেহারা ইত্যাদি সবই অন্য রকম। এই ভিন্নতাই হয়ত কবির উপহাসের অন্যতম কারণ। কবি তাই বিলাতী পাড়ায় নববর্ষের বিলাতী উৎসবকে উপলক্ষ্য করে উপহাস করেছেন। ইংরেজ মহিলাও এই পরিহাসের আক্রমণ থেকে মুক্তি পাননি। তারই বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন :—

বিড়ালাক্ষি বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছুটে,
আহা তায় রোজ রোজ কত 'রোজ' ফুটে।
সুপ্রকাশ্য কিবা আস্য মৃদু হাস্য ভরা
অধরে অমৃত সুধা প্রেম ক্ষুধা-হরা।
গোলাপের দলে বিবি গড়িয়াছে চিক
অনঙ্গ ভ্রমররূপে মাগে তথা ভিখ্। (ইং নববর্ষ)

ভোজ্য বস্তুকে বিষয় করে খুব কম কবিই কবিতা রচনা করেছেন। আর এবিষয়েও কবি ঈশ্বর গুপ্তের জুড়ি মেলা ভার। এ' জাতীয় রচনায়ও কবির অনন্য সাধারণ রচনাবৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। সাধারণতঃ এ-জাতীয় বিষয়গুলিও কবিদের কবিতার বিষয় হওয়া যেন একটা বিস্ময়কর বৈচিত্র্য। কবি কি খাবেন বা খেতে ভালবাসেন, বা কি খেতে পছন্দ করেন না, বা তিনি আদৌ ভোজনবিলাসী ছিলেন কিনা এ-সব খবর জানতে পারাও যেন পাঠকের কাছে একটা আশাতিরিক্ত লাভ, একটা অচিন্তিতপূর্ব চমক। যাকে বলা যায় নিতান্ত 'ব্যক্তিগত রস'। ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যে এ-ধরণের রচনা বিশেষ কবি-প্রতিভার পরিচিতি বহন করছে। কবি এ-সমস্ত সাধারণ বিষয়কে কবিতার রাজ্যে প্রবেশাধিকার দিয়ে তাদের সুষ্ঠু রুচিসম্মত ও সৌষ্ঠবময় আকার দান করেছেন। বিষয়ের দিক থেকে আম, আনারস, মাছ, মাংস, বেগুন, লাউ কিছুই বাদ পড়েনি। কবিতার এ-ধরণের বিষয় নির্বাচনে কবি যেমন অসাধারণ সাহস ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় রুচিবোধ ও আচারনিষ্ঠা এবং স্বদেশীয় প্রতিবেশ-প্রীতির অপূর্ব স্বাক্ষর রচনা করেছেন। এক কথায় বাঙগালীর ঘর ও বাহির যেন কবির কাব্যে অনবদ্যভাবে ধরা পড়েছে—অভিনব রূপলাবণ্যময় মূর্তিতে বিলসিত হয়েছে।

কবির এ-জাতীয় রচনার আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল—প্রত্যেকটি ভোজ্য বস্তুকে কবি দুভাবে উপভোগ করেছেন। প্রথম তা'র দৈহিক সৌন্দর্য কবির নয়নকে আনন্দ দান করেছে। দ্বিতীয় তা'র আস্বাদ তাঁর রসনাকেও তৃপ্তি ও আনন্দ দিয়েছে। আর তিনি তাঁর সেই আনন্দ প্রকাশ করেছেন পরিহাসের মধ্য দিয়ে। তবে শুধু যে

পরিহাস করেই কবি এসব বিষয়কে রসাল ও আকর্ষণীয় করেছেন তা নয়। এই পরিহাসের অন্তরালেও মাঝে মাঝে কবি পরিহাস ছাড়িয়ে তাত্ত্বিকের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন—পরিহাস ও তত্ত্ব তখন হাত ধরাধরি করে পাঠকের রসবোধকে চঞ্চল ও গম্ভীর করে তুলেছে। "তপসে" মাছের কথা বলতে গিয়ে কবি তার সৌন্দর্য বর্ণনায় যেন পঞ্চমুখ। চিত্রকরের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি লিখেছেন :—

কষিত কনককান্তি কমনীয় কায়
গাল ভরা গোঁফ দাড়ি তপস্বীর প্রায়।
মানুষের দৃশ্য নও বাস কর নীরে
মোহন মণির প্রভা ননীর শরীরে। (তপসে মাছ)

কিন্তু কবির কাছে চোখের আকর্ষণ থেকেও রসনার আকর্ষণ যেন বেশি। তাই তিনি বলেছেন—

কোন মতে মেটে রসনার ক্ষোভ
যত পাই তত খাই তবু বাড়ে লোভ।
ভেজে খাই, ঝোলে দিই, কিম্বা দিই ঝালে
উদর পবিত্র হয় দেবা মাত্র গালে। (ঐ)

কবি এ-হেন জীবকে রসনার তৃপ্তি থেকে দূরে রাখেন কি করে। কবি তপসে মাছের আভিজাত্যও স্বীকার করেছেন এবং আমাদের কাছে তার গৌরব প্রতিষ্ঠা করেছেন এই বলে :

এমন অমৃত ফল ফলিয়াছে জলে
সাহেবরা সুখে তায় "ম্যাঙ্গোফিস" বলে
ব্যয় হেতু কোন মতে হয়না কাতর
ধামায় আনায় কত করি সমাদর। (ঐ)

ইংরেজরাও কবির মতে তপসে মাছ সমান ভালবাসে।

এ-বিষয়ে তাঁরা যেন কবির সঙ্গে সমানধর্মী। কিন্তু মাছের তুলনায় মাংসেই যেন কবির বেশি অভিরুচি। তাঁর বিশ্বাস বাঙ্গালী মাছ স্বাভাবিকভাবেই ভালবাসে, তবু মাংসের কাছে তা যেন অনেক কম :

...মাছের কিছু আছে মান বাঙ্গালীর কাছে।
কিন্তু মাছ পাঁঠার নিকট কোথা রয়
দাস দাস তস্য দাস তস্য দাস নয়॥ (পাঁঠা)

সত্যিই, কবির এ বিশ্বাস যে কত বাস্তবরসভিত্তিক ও গভীর পর্যবেক্ষণময় তথ্যসমৃদ্ধ, তা আমরা সাধারণ বাঙ্গালীরা সহজেই বুঝতে পারি। কবির মতে শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ হল ছাগ-মাংস। তাই কবি এই বস্তুটির জন্যে পাগল হয়েছেন বলতেও কুণ্ঠা বোধ করেননি :—

রসভরা রসময় রসের ছাগল
তোমার কারণে আমি হয়েছি পাগল। (ঐ)

বাঙ্গালী জাতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল তার এই অপূর্ব ভোজন-বিলাসিতা। বাঙ্গালীর জাতীয় বৈশিষ্ট্যের এই দিকও কবির কাব্যে অপরূপ বাণীমূর্তি লাভ করেছে। ভোজনে রসনার পরিতৃপ্তিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন কবি; রসনার জন্য অফুরন্ত রস সংগ্রহ করে বা সঞ্চিত করে রেখেছে যে ছাগ-মাংস, সেই যুক্তি দেখিয়ে লিখেছেন :

মজাদাতা অজা তোর কি লিখিব যশ
যত চুষি তত খুসী হাড়ে হাড়ে রস।

কবি এই অজার গুণকীর্তন করতে গিয়ে অন্যত্র বলেছেন :—

সাধ্য কার একমুখে মহিমা প্রকাশে।
আপনি করেন বাদ্য, আপনার নাশে॥

হাড়কাটে ফেলে দিই, ধোরে দুটি ঠ্যাঙগ্।
সে সময়ে বাদ্য করে ছ্যাড্যাঙ্গ্ ছ্যাড্যাঙগ্॥
এমন পাঁঠার নাম, যে রেখেছে বোকা।
নিজে সেই বোকা নয়, ঝাড়বংশ বোকা॥ (ঐ) ইত্যাদি।

আবার 'আনারসের' রস বিশ্লেষণে কবি যখন তৎপর হয়ে উঠেন, তখন 'আনারস' কবির বর্ণনা ও বিশ্লেষণের অপেক্ষা না করেই যেন আমাদের রসনার রসক্ষরণের উপাদান হয়ে ওঠে। কবির রসগ্রাহী ও লোভনীয় বর্ণনার গুণে এই আকর্ষণের গতিবেগ যেন অসম্ভব বেড়ে যায়। কবির বর্ণনভঙ্গি ও শব্দপ্রয়োগ-কৌশলটিও এক্ষেত্রে লক্ষণীয় :—

লুন মেখে লেবু, রসে যুক্তকরি।
চিন্ময়ী চৈতন্যরূপা, চিনি তায় ভরি॥

এসব উদাহরণ তাঁর কবি-প্রতিভার অন্তরঙ্গ দিকের কথা, স্বরূপের কথা। কবিতার বহিরঙ্গের বিচারেও গুপ্ত কবি অসামান্য কীর্তির স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

অসাধারণ শব্দকৌশলী তিনি; তাঁর রচনায় শব্দগত গুণও যেমন, শব্দদোষও তেমনি চোখে পড়ে। কবির প্রতিভার এই দিকটির কথা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অনবদ্য ভাষায় বিশ্লেষণ করেছেন : "যখন অনুপ্রাস যমকে মন না থাকে, তখন তাঁহার বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালা সাহিত্যে অতুল। যে ভাষায় তিনি পদ্য লিখিয়াছেন, এমন খাঁটি বাঙ্গালায়, এমন বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষায়, আর কেহ পদ্য কি গদ্য কিছুই লেখে নাই। তাহাতে সংস্কৃতজনিত কোন বিকার নাই,—ইংরেজিনবিশীর বিকার নাই। পাণ্ডিত্যের অভিমান নাই—বিশুদ্ধির বড়াই নাই। ভাষা হেলে না, টলেনা, বাঁকেনা—সরল সোজাপথে চলিয়া গিয়া পাঠকের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করে। এমন

বাঙগালীর বাঙগালা ঈশ্বর গুপ্ত ভিন্ন আর কেহই লেখে নাই —আর লিখিবার সম্ভাবনা নাই। কেবল ভাষা নহে—ভাবও তাই।” শব্দবিন্যাস, যমক ও অনুপ্রাস-সৃষ্টির অবাধ গতি তাঁর কবিতাকে এক বিশিষ্ট মূল্য দিয়েছে। অবশ্য সর্বত্রই যে এই প্রয়াস সফল হয়েছে, তা নয়; মাঝে মাঝে এই অতিরিক্ত শব্দাড়ম্বরপ্রিয়তা ও অলঙ্কার প্রয়োগ কবির কাব্যসুষমার হানিও ঘটিয়েছে। তবুও কবির এই অলঙ্কার প্রয়োগ এক এক স্থানে অপূর্ব রসসৃষ্টি করেছে,—রচনাকে করেছে আকর্ষণীয়। কি আধ্যাত্মিক কবিতা, কি ব্যঙ্গ-কবিতা, কি রূপ-বর্ণনা, প্রায় সর্বত্রই কবির লেখনী অব্যাহত গতিতে, লীলায়-লাস্যে চপল হয়ে উঠেছে। একটি আধ্যাত্মিক কবিতায় তিনি বলেছেন :—

“ভবে না তুমিই রবে আমিই রব
রবে কেবল রবটি রবে।
চরমে হবে ভাল গুপ্ত আলো
প্রভাকরে টেনে লবে।

এর আধ্যাত্মিক মূল্য ছাড়াও গুপ্ত-কবির ‘প্রভাকর’-প্রীতি সুন্দররূপে অভিব্যক্ত। তাছাড়া উদ্ধৃত অংশটিতে অনুপ্রাস ও যমক দুটি অলঙ্কারেরই মিলন ঘটেছে। এই অনুপ্রাস ও শব্দবিন্যাসের ঝঙ্কারে সমৃদ্ধ কবিতার মধ্যে নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলি চিরকালের জন্য বাঙগালী পাঠকের রসবোধকে তৃপ্তি দান করে—

লোকে বলে আনারস, আনা রস নয়।
আনা রস হলে কভু জানা রস হয়॥
তারে তার জানা যায়, রস ষোল আনা।
অরসিক লোক তবু বলে তারে আনা॥

অথবা

একবার রসনায় যে পেয়েছে তার
আর কিছু মুখে নাহি ভাল লাগে তার।

তাঁর আরো অনেক অনুপ্রাস দক্ষতার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে এর আগেই। গুপ্ত-কবির অনুপ্রাস-প্রয়োগ-সিদ্ধ আর দুটি উদাহরণ উদ্ধৃত করেই এই পর্যায়ের আলোচনার শেষ করব। তাঁর "বোধেন্দু বিকাশ" গ্রন্থ থেকেই উদ্ধৃতি দুটি উদাহরণ হিসাবে দেওয়া হল। এই দুটি রচনা কবি গান হিসেবেই প্রধানত লিখেছেন, তবে এর কাব্যমূল্যও আছে। কবি যে গান রচনায়ও বিশেষভাবে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, এই দুটি রচনা তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ঘোষণা করছে :—

(১) (রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।)

কেরে, বামা, বারিদ বরণী,
তরুণী, ভালে ধরেছে তরণি,
কাহারো ঘরণী, আমি যে ধরণী, করিছে দনুজ জয়।
হের হে ভূপ, কি অপরূপ, অনুপ রূপ, নাহি স্বরূপ,
মদননিধনকরণকারণ, চরণ শরণ লয়॥
বামা, হাসিছে ভাষিছে, লাজ না বাসিছে,
হুহুঙ্কার রবে, বিপক্ষ নাশিছে, গ্রাসিছে বারণ, হয়।
বামা, টলিছে চলিছে, লাবণ্য গলিছে,
সঘনে বলিছে, গগনে চলিছে,
কোপেতে জ্বলিছে, দনুজ দলিছে, ছলিছে ভুবনময়!
কে রে, ললিতরসনা, বিকটদশনা,
করিয়ে ঘোষণা, প্রকাশে বাসনা,
হয়ে শবাসনা, বামা বিবসনা, আসবে মগনা রয়।"

বলা বাহুল্য, এই রচনার মুখ্য প্রতিপাদ্য আদ্যাশক্তি শিব-বক্ষোপরি দণ্ডায়মানা কালিকার রূপবর্ণনা। অনুপ্রাসের দোলায় পাঠকের মনও দুলে উঠে। এই রচনায় প্রধানত 'ন' কারের অনুপ্রাস লক্ষণীয়।

(২) (রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।)

কে রে বামা, ষোড়শী রূপসী,
সুবেশী, এ, যে, নহে মানুষী,
ভালে শিশুশশী, করে শোভে অসি, রূপমসী, চারুভাস।
দেখ, বাজিছে ঝম্প, দিতেছে ঝম্প,
মারিছে লম্ফ, হতেছে কম্প,
গেলরে পৃথ্বী, করে কি কীর্তি, চরণে কৃত্তিবাস॥
কে রে, করাল-কামিনী, মরাল গামিনী,
কাহার স্বামিনী, ভুবন ভামিনী,
রূপেতে প্রভাত, করেছে যামিনী, দামিনী জড়িত-হাস।
কে রে, যোগিনী সঙ্গে, রুধির রঙ্গে
রণতরঙ্গে, নাচে ত্রিভঙ্গে,
কুটিল পাঙ্গে, তিমির-অঙ্গে, করিছে তিমির নাশ।
আহা, যে দেখি পর্ব, যে ছিল গর্ব,
হইল খর্ব, গেলরে সর্ব,
চরণ সরোজে, পড়িয়ে শর্ব, করিছে সর্বনাশ।
দেখি, নিকট মরণ, কর রে স্মরণ
মরণহরণঅভয়চরণ
নিবিড়নবীননীরদবরণ, মানসে কর প্রকাশ।

এই রচনাটিতেও আদ্যাশক্তি ষোড়শীরূপিণীর রূপ ও শক্তির বর্ণনা করেছেন কবি। অলঙ্কারে অলঙ্কার দিয়ে কবির

মানস-প্রতিমার মহিমাময়ী মূর্তি রূপায়িত করেছেন। এখানে 'শ'- বা 'স'- বা 'ষ'-কারই প্রাধান্য পেয়েছে অনুপ্রাস-সৃষ্টিতে। এই রচনাতেও কবির অনুপ্রাস-সৃষ্টি-চাতুর্য ও চমৎকারিত্ব বিশেষ লক্ষণীয়। এই হলো কবি ঈশ্বর গুপ্তের কবি-প্রতিভার মোটামুটি পরিচয়। প্রাচীন বাংলা যুগের নিধু বাবু, হরু ঠাকুর, রাম বসু, নিতাই বৈরাগী, রামু ও নৃসিংহ থেকে এই যুগের সুরু, এবং উত্তর-যুগের দীনবন্ধু-বঙ্কিমচন্দ্রে এই যুগের শেষ। গুপ্ত-কবি এই প্রাচীন ও নবীন বঙ্গের সেতু।

আমরা এতক্ষণ কবি ঈশ্বর গুপ্তের কবি-প্রতিভার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছি। এখন কবি-স্বরূপের কিছু পরিচয় জানারও তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা আছে। কারণ কবি-কর্মকে বুঝতে হলে, জানতে হলে কবিকে, কবি-মানুষকে বুঝতে হবে, জানতে হবে। তাই কবির জীবনী জানাও এদিক থেকে অপরিহার্য। মূলতঃ কবি-জীবনের বিশেষ ঘটনাগুলি কবি-মনের বিশেষ দিকগুলির সঙ্গে মিতালী পাতিয়ে চলে। কবি-জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা বা কাজ অনেক কবির কাব্য-রচনা বা প্রেরণার মূল উৎস। কখনও কখনও কাব্যের মূল সুরে অনুরণিত ও অনুস্যূত। আমাদের কবি ঈশ্বর গুপ্তের জীবনও এর ব্যতিক্রম নয়। আমাদের দেশের বহু প্রতিভাবান ও স্বনামখ্যাত কবিদের জীবনে কাব্যপ্রেরণা বা রচনার উৎসরূপে যে কাজ করেছে কবিদের জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা,—এমন প্রমাণ মোটেই অপ্রতুল নয়। স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জীবনেও এই সত্যটি বিশেষভাবে কাজ করেছে।

কবি ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় কারো কারো মতে যে তথা-

কথিত অশ্লীলতা বর্তমান, তার মূল খুঁজতে হলে কবি-জীবনের পটভূমিকার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে। অন্যথা এর স্বরূপ বোঝা যাবে না। ঈশ্বর গুপ্তের এই তথাকথিত অশ্লীলতা ক্রোধসম্ভূত; অর্থাৎ এই ক্রোধ বা ক্ষোভ জন্মেছে কবির মেকির প্রতি বীতশ্রদ্ধা ও ঘৃণা থেকে। বস্তুতঃ কবি ঈশ্বর গুপ্ত মেকির বড় শত্রু ছিলেন। তাছাড়া কবির ব্যক্তিজীবনের মূল থেকেও এই ক্রোধজনিত-অশ্লীলতা রস সঞ্চয় করে কাব্যেও সঞ্চারিত করেছে। ঈশ্বর গুপ্তের জীবনের এই বিশেষ অবস্থার বিশ্লেষণ বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় নিম্নরূপ :

"ঈশ্বর গুপ্ত ধর্মাত্মা, কিন্তু সেকেলে বাঙ্গালী। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা অশ্লীল। সংসারের উপর, সমাজের উপর তাঁর রাগের অনেক কারণ ছিল। সংসার, বাল্যকালে বালকের অমূল্য রত্ন যে মাতা তাহা তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইল। খাঁটি সোনা কাড়িয়া লইয়া তাহার পরিবর্তে এক পিতলের সামগ্রী দিয়া গেল—মার বদলে বিমাতা। (উল্লেখযোগ্য যে, কবির মাতার অকাল বিয়োগ হলে কবির পিতা তখন দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন, এই বিমাতার ব্যবহারে কবি বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন না, নানাভাবে উৎপীড়িতও হয়েছেন)। তারপর যৌবনের যে অমূল্যরত্ন—শুধু যৌবনের কেন যৌবনের প্রৌঢ় বয়সের, বার্ধক্যের তুল্যরূপেই অমূল্যরত্ন যে ভার্যা, তাহার বেলাও সংসার বড় দাগা দিল। (বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল, কবির অনিচ্ছাসত্ত্বেও এবং পছন্দ না হওয়া সত্ত্বেও কবির পিতা কবিকে বিবাহ দেন। কবির ভার্যা নাকি মোটেই সুশ্রী বা রূপবতী ছিলেন না। কবির ইচ্ছা ছিল একটি ধনী পরিবারের সুন্দরী কন্যাকে ঘরে আনেন। কিন্তু বিধি বাম। কাঁচড়াপাড়ার কোন এক ধনী পরিবার কবিকে কন্যা পাত্রস্থ করবেন বলেও নাকি কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু কবির পিতা প্রায় জোর করেই কবিকে এই বিবাহে বাধ্য করেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই অনাসক্তি ও বীতস্পৃহা জন্মে প্রথমে এই বিবাহের প্রতি, ক্রমে সংসারের প্রতি। লক্ষ্য করবার বিষয়, কবি কোনদিন তাঁর এই নববিবাহিতা পত্নীর প্রতি কোন দুর্ব্যবহার বা রূঢ় আচরণ করেননি। মহৎ কবির মহত্ত্ব এখানেই।) যাহা গ্রহণীয়

নহে, ঈশ্বরচন্দ্র তাহা লইলেন না, কিন্তু দাগাবাজীর জন্য সংসারের উপর ঈশ্বরের রাগটা রহিয়া গেল। তারপর অল্পবয়সে পিতৃহীন সহায়হীন হইয়া, ঈশ্বরচন্দ্র অন্নকষ্টে পড়িলেন। কত বানরে বাইরের অট্টালিকায় শিকলে বাঁধা থাকিয়া ক্ষীর সর পায়সান্ন ভোজন করে আর তিনি দেবতুল্য প্রতিভা লইয়া ভূমণ্ডলে আসিয়া শাকান্নের অভাবে ক্ষুধার্ত। কত কুক্কুর বা মর্কট বরুষে জুড়ী জুতিয়া, তাঁহার গায়ে কাদা ছড়াইয়া যায়, আর তিনি হৃদয়ে বাগ্দেবী ধারণ করিয়া খালি পায়ে বর্ষার কাদা ভাঙ্গিয়া উঠিতে পারেন না। দুর্বল মনুষ্য হইলে এ অত্যাচারে হার মানিয়া, রণে ভঙ্গ দিয়া, পলায়ন করিয়া দুঃখের অন্ধকার গহ্বরে লুকাইয়া থাকে। কিন্তু প্রতিভাশালীরা প্রায়ই বলবান।

ঈশ্বর গুপ্ত সংসারকে, সমাজকে স্বীয় বাহুবলে পরাস্ত করিয়া, তাহার নিকট হইতে ধন, যশ, সম্মান আদায় করিয়া লইলেন। কিন্তু অত্যাচারজনিত যে ক্রোধ তাহা মিটিল না।"

এই ক্রোধ অনেক সময় কবির রচনায় আত্মপ্রকাশ করেছে। কাজেই কবি ঈশ্বর গুপ্তকে বুঝতে হলে এই পটভূমিকাটিকে ভালভাবে বুঝতে হবে—মানুষ ঈশ্বরচন্দ্রকে বুঝতে হবে! তাই "ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ব কি প্রকার, তাহা বুঝিতে গেলে তাহার দোষগুণ দুই বুঝাইতে হয়। শুধু তাই নয়। ঈশ্বর গুপ্ত নিজে কি ছিলেন" তাই বুঝতে হবে, কারণ "কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ। কবিতা দর্পণ মাত্র—তাহার ভিতর কবির অবিকল ছায়া দেখিয়া তাহাকে বুঝিব। কবিতা, কবির কীর্তি—তাহা ত আমাদের হাতের কাছেই আছে—পড়িলেই বুঝিব। কিন্তু যিনি এই কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি কি গুণে, কি প্রকারে এই কীর্তি রাখিয়া গেলেন, তাহাই বুঝিতে হইবে। তাহাই জীবনী ও সমালোচনাদত্ত প্রধান শিক্ষা, জীবনী ও সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।"

ঈশ্বর গুপ্ত অনেকগুলি নৈতিক ও পারমার্থিক বিষয়ক কবিতা লিখেছেন। অনেকের পক্ষে ঐগুলি নীরস মনে হতে পারে, কিন্তু তাঁকে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে হলে তাঁর ঐ শ্রেণীর রচনাগুলি অবশ্যই পঠনীয়। এগুলিতে কবির আন্তরিক কথা আছে। কবির মনের প্রকৃত পরিচয়, কবিধর্ম, এককথায় কবির জীবনদর্শন অপূর্ব প্রতিভাত হয়েছে। ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে রামপ্রসাদের এদিক থেকে বিশেষ এক সাদৃশ্য চোখে পড়ে। দুজনেই সাধক কবি, দুজনেই বৈদ্য কবি। এঁরা কেউ বৈষ্ণব ছিলেন না, কেউই ঈশ্বরকে দেখেননি সখা, প্রভু, পুত্র বা কান্তভাবে। রামপ্রসাদ ঈশ্বরকে দেখেন মাতৃভাবে, আর ঈশ্বর গুপ্ত পিতৃভাবে। রামপ্রসাদের মাতৃপ্রেমে আর ঈশ্বরচন্দ্রের পিতৃপ্রেমে ভেদ বড় অল্প। নিম্নোদ্ধৃত একটি কবিতাতেই কবির জীবনদর্শনের মূল্য ও স্বরূপ খুঁজে পাওয়া যাবে।

"তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত ত্রিসংসার।
আমি হে ঈশ্বর গুপ্ত কুমার তোমার॥
পিতৃ নামে নাম পেয়ে, উপাধি পেয়েছি।
জন্মভূমি জননীর কোলেতে বসেছি॥
তুমি গুপ্ত আমি গুপ্ত; গুপ্ত কিছু নয়।
তবে কেন গুপ্ত ভাবে ভাব গুপ্ত রয়?

আবার যখন দেখি—

তোমার বদনে যদি, না সরে বচন।
কেমনে হইবে তবে, কথোপকথন॥
আমি যদি কিছু বলি, বুঝে অভিপ্রায়।
ইসেরায় ঘাড় নেড়ে, সায় দিও তায়॥

কবির আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার বিষয়। তাঁর

রচনায় সামাজিক ব্যাপারগুলির বর্ণনা খুবই মনোহর। আসল কথা, তাঁর কবিতার অপেক্ষা তিনি অনেক বড় ছিলেন। তাঁর প্রকৃত পরিচয় শুধু তাঁর কবিতাই নয়। যাঁরা "বিশেষ প্রতিভাশালী" তাঁরা প্রায়ই "আপন সময়ের অগ্রবর্তী" হয়ে থাকেন। কবি ঈশ্বর গুপ্তও আপন সময়ের অগ্রবর্তী ছিলেন। উদাহরণে বিষয়টি পরিস্ফুট হবে। কবির যে বিশেষ কতকগুলি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী আছে, তার মধ্যে দেশ-বাৎসল্য অন্যতম। বাঙ্গালীদের মধ্যে তখন এই গুণটির বিশেষ অভাব ছিল। কবি ঈশ্বরচন্দ্রের সময়ে আরো বিরল ছিল। একমাত্র রামমোহনকে বাদ দিলে, তখনকার দিনে বাংলা দেশে রামগোপাল ঘোষ ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে দেশ বাৎসল্যের প্রথম নেতা বলা যায়। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাঁদেরও পূর্বগামী। কবির এই দেশবাৎসল্য তাঁদের মত ফলপ্রদ না হলেও সে দেশপ্রেমের বিশিষ্টতার কথা ভোলবার নয়।

ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসীগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥

এ তাঁরই কথা। তখনকার লোকের কথা দূরে থাক, এখনকার কজন লোক এ আদর্শের সমজ্দার? এযুগের কয়জন লোক এক্ষেত্রে ঈশ্বর গুপ্তের সমকক্ষ? কবির কথায় যা, কাজেও তাই ছিল। তিনি বলেছেন "মাতৃসম মাতৃভাষা"। আশার কথা, আজকাল অনেকেই মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাবান ও অনুরাগী হয়েছেন, কিন্তু গুপ্তকবির সময়ে একথা বলার সৎসাহসও কারো ছিল না। কবির এই দেশবাৎসল্যে কোন

মেকী বা কৃত্রিমতা ছিল না। আজকের অনেকের তথাকথিত অতি বিঘোষিত দেশবাৎসল্য নিতান্তই একটা প্রতারণার, একটা কৃত্রিমতার ছদ্মবেশ মাত্র। এই ধরনের দেশপ্রেমে নেই কোন আন্তরিকতার সুর, নেই নিষ্ঠার রস; আছে শুধু স্বার্থসিদ্ধির সুকৌশল প্রয়াস, সহজে নামকেনার অপচেষ্টামূলক অভিসন্ধি। কাজেই ঈশ্বরগুপ্তীয় দেশপ্রেমে এবং এযুগের আত্মপ্রচার-মূলক দেশপ্রেমে পার্থক্যের পরিমাপ সহজেই অনুমেয়। গুপ্ত-কবির আর একটি বৈশিষ্ট্য—ধর্ম। কবি ঈশ্বরচন্দ্র ধর্মেও সমকালীন লোকদের অগ্রবর্তী ছিলেন। তিনি হিন্দু ছিলেন, কিন্তু তাই বলে কোন উপধর্ম বা তথাকথিত সংস্কারধর্মকে হিন্দুধর্ম বলে গ্রহণ করেননি। ঈশ্বর গুপ্ত বিশুদ্ধ, পরম-মঙ্গলময় হিন্দুধর্মকেই মানতেন। আর এই ধর্মের যথার্থ মর্ম জানবার জন্যে তিনি সংস্কৃত-অনভিজ্ঞ হয়েও অধ্যাপকের সাহায্যে বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্র পড়েছেন এবং অসাধারণ ধীশক্তির অধিকারী ছিলেন বলে সকল বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য জন্মেছিল। তাঁর তত্ত্বমূলক, পারমার্থিক রচনাগুলিতে কবির এই জ্ঞানের বিশেষ প্রকাশ বিন্যস্ত হয়েছে।

ঈশ্বর গুপ্তের রাজনীতি বড় উদার ছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের ব্যক্তি-মনের এই হলো আরেকটি উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য। তাতেও তিনি আপন সময়ের অগ্রবর্তী ছিলেন। একথা বুঝিয়ে বলার তেমন দরকার হবে না। আশা করি, বিদগ্ধ পাঠক সহজেই এই বিষয়টির তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারবেন। ঈশ্বর গুপ্ত যত পদ্য লিখেছেন, এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবেন না। কবির আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি একাধারে নূতন লেখক সৃষ্টি ও পুরাতন লেখকের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, যা সেযুগের আর কারো মধ্যে দেখা

যায়নি। শুধু সে যুগে কেন, এ-যুগেরও অনেকের মধ্যেই তার বিলক্ষণ অভাব।

ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনী পাঠে জানা যায় যে, কবি বাল্যাবস্থা থেকেই অত্যন্ত কষ্টে কালযাপন করেছেন। অন্যের অন্নে প্রতিপালিত হয়েছেন, পর-পৃষ্ঠপোষকতায় জীবনের তমিস্রার্ণব পার হয়ে আলোকের তীরে উত্তোরণ করেছেন। পরবর্তী জীবনে যখন তিনি লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর যুক্তভাবে কৃপা লাভ করেছেন, লক্ষ্মীর কমলবনে সরস্বতীর বীণাবাদন কবির জীবনে অনুরণিত ও ছন্দিত হয়েছে, তখনও তিনি তাঁর বাল্যের দুরবস্থার কথা ভুলে যাননি; ভুলে যাননি সেইসব মহনীয় বরণীয় ব্যক্তিদের বদান্যতা ও সহানুভূতির কথা। উত্তরজীবনে কবিই এই বদান্যতা, সহানুভূতি ও সহমর্মিতার চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। দীনদুঃখী, আত্মীয় অনাত্মীয়, পরিচিত অপরিচিত, সকলেই কবির কাছ থেকে এই অযাচিত কৃপা বা দয়া ও দাক্ষিণ্য লাভ করেছে। কবি যখন প্রতিষ্ঠার স্বর্ণচূড়ায় সমাসীন, তখনই তিনি কমলার দান দু' হাতে কুড়িয়েছেন, তেমনি আবার দু'হাতে বিলিয়েছেন। একটি পয়সাও সঞ্চিত করেননি। অনেকে তাঁর এই স্বভাব-সুলভ সরলতার সুযোগ নিয়ে অনেক অর্থ আত্মসাৎ করেছে, কবিকে করেছে নানাভাবে প্রতারিত। কিন্তু তাতেও কবি মানুষ হিসেবে মানুষের উপর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা হারাননি। সাধারণের দুঃখে এমন করে যাঁর হৃদয় করুণায় বিগলিত হয়েছে, তাঁর মানবতাবোধ, তাঁর মানব-প্রীতি কত গভীর, কত বড়, কত ব্যাপক—এর পরিমাপ করবে কে? আজ যারা সাহিত্যে সাম্যবাদ-এর (তথাকথিত সাম্যবাদ) প্রচার করেন, আমার মনে হয়, বাংলাসাহিত্যের সাম্যবাদের প্রথম উদ্গাতা কবি ঈশ্বর-

চন্দ্র। কাজেই কাব্য অপেক্ষা মানুষ, কবি অপেক্ষা ব্যক্তি ঈশ্বরচন্দ্র অনেক বড়, অনেক মহান, অনেক গরীয়ান ছিলেন। কাব্য ও কবি তাই একবৃন্তে দুটি কুসুমের মত,—এক মহা-সম্মিলন ঘটেছে ঈশ্বরচন্দ্রে। এমন নিদর্শন পৃথিবীর সাহিত্যেও বড় বেশী পাওয়া যায় না। সমগ্র জীবনটাকে কাব্য-ময় করা, আবার সমগ্র কাব্যের প্রাণরস ঐ জীবনের মূলে,—এমন ভাবসুন্দর অপূর্ব অভিব্যক্তি সচরাচর চোখে পড়ে না।

তাই কবি ঈশ্বরচন্দ্রকে বুঝতে হলে বুঝতে হবে ব্যক্তি বা মানুষ ঈশ্বরচন্দ্রকে। তবেই জানা সম্পূর্ণ হবে, সার্থক হবে। যেমন অঙ্গকে চিনতে হলে অঙ্গীকে জানতে হবে, দুইকে পৃথক করে বিক্ষিপ্ত করলে জানা যথার্থ হয় না, তেমনি ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর কাব্যের বাইরে নয়, আবার কবির কাব্যও মানুষ ঈশ্বরচন্দ্রকে বাদ দিয়ে নয়। এই হলো গুপ্ত কবির যথার্থ কবি-স্বরূপ, যথার্থ ব্যক্তিসত্তা। এবার কবি হিসেবে ঈশ্বর-চন্দ্রের আর কয়েকটি বিস্মৃত প্রায় বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেই এই পর্য্যায়ের আলোচনা শেষ করব। গুপ্ত কবির জীবনীকার প্রথমেই কবি-জীবনের একটি কিংবদন্তীর কথা বলেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র ছয় বৎসর বয়সেই নাকি প্রথম নিম্নলিখিত দুইটি বিখ্যাত কবিতার পংক্তি রচনা করেছেন:

"রাতে মশা দিনে মাছি
এই নিয়ে কলকাতায় আছি।"

এরূপে অভ্যাস করতে করতে তাঁর নৈসর্গিক রচনাশক্তির পরিপ্রকাশ ঘটে। আশ্চর্যের বিষয় যে, স্বয়ং কবিগুরুরও বোধকরি এই বয়সে প্রথম কাব্যে হাতেখড়ি হয়নি। কবিগুরুর প্রথম রচনা আনুমানিক এগার বৎসরে রচিত। উত্তরকালে গুপ্তকবির অসাধারণ কবিখ্যাতিতে মুগ্ধ হয়ে মহামতি বেথুন

সাহেব (কারো মতে বিটন সাহেব) ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুলাই একটি ঐতিহাসিক পত্র লেখেন কবিকে। পত্রটি দীর্ঘ, কাজেই সম্পূর্ণ প্রকাশ না করে প্রয়োজনীয় অংশের উল্লেখ করা হচ্ছে। উৎসাহী পাঠক আশা করি উক্ত পত্রটি পাঠ করলে আমার বক্তব্য আরও আকর্ষণীয় ও প্রাঞ্জল মনে হবে। এই পত্রটি নানা কারণে ঐতিহাসিক। সেযুগের একজন ইংরেজ রুচিবিরোধী স্বদেশপ্রেমিক কবির একজন উচ্চশিক্ষিত রাজ-পুরুষস্থানীয় ইংরাজ উচ্ছ্বসিতভাবে প্রশংসায় মুখর হবেন—এ' আশা যথার্থ হলেও যথেষ্ট আশ্চর্যজনক। গুপ্তকবি অনেক সময় এই ইংগ-বংগ কালচারকে মোটেই সুনজরে দেখেননি। অথচ পত্রটিকে কবি-জীবনের খ্যাতির একটি অসাধারণ বহু-মূল্য স্মারক বলা যেতে পারে। সেকালে উচ্চশিক্ষিত ইংরেজ বেথুন সাহেবের মত ব্যক্তির প্রশংসা কুড়ানো কমভাগ্য ও কৃতিত্বের কথা নয়। যদিও কবির যথার্থ কবিখ্যাতির পক্ষে এটি মোটেই অপরিহার্য নয়, তবুও আমি একে নারীদেহের স্বাভাবিক সৌন্দর্যাতিরিক্ত অলঙ্কারস্বরূপ মূল্য দিয়েছি। পত্রটির মর্মার্থ হল—

> "লেখকদিগের মধ্যে আপনিই একজন প্রধান ও সুকবি; আপনি যদি পরিশ্রম স্বীকারপূর্বক সুকুমারমতি বালকবালিকাবর্গের পাঠোপযোগী একখানি কাব্য রচনা করেন তাহা হইলে আপনার দেশীয় লোকেরা অবশ্যই আপনার নিকট বাধিত হইবেন এবং আমিও সেইসূত্রে বাধিত হইব। বিলাতের সুবিখ্যাত সুলেখকগণ বালক-বালিকাগণের শিক্ষাপযোগী পুস্তকাদি প্রস্তুত করণের কার্যকে আপনাপন প্রভূত মহিমার হানিজনক বোধ করেন না। আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে ইংরাজী ভাষার শিশুপাঠোপযোগী যেসকল সুললিত কবিতা আছে, তাহা আমি আপনাকে দেখাইতে পারি; তাহা যে আপনার অবলম্বনীয় বিষয়ে সাহায্য দান করিবে, ইহা বলা বাহুল্য......।"

বস্তুতঃ ঈশ্বরচন্দ্রের এ-বিষয়ে যে প্রতিভা ছিল এবং কবি ইচ্ছা করলেই যে সুললিত শিশুপাঠ্য রচনা করতে পারতেন —এ-বিষয়ে বেথুন সাহেবের উপযুক্ত ধারণা ছিল। স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে আমাদের দেশে মহাত্মা বেথুনের বিশেষ অবদান আছে। কাজেই কবির প্রতি বেথুন সাহেবের ঐ পত্র রচনাকে কবি-খ্যাতির সরকারী-স্বীকৃতি বললে অত্যুক্তি হবে না। আর বেথুন সাহেবের সেই মহামান্য অনুরোধেরই ফলস্বরূপ কবি রচনা করলেন বিষ্ণুশর্মাকৃত হিতোপদেশ-এর মিত্রলাভ, সুহৃদ্ভেদ, বিগ্রহ ও সন্ধি—এই চারটি বিষয় নিয়ে "হিতপ্রভাকর"।

গুপ্তকবির রচনাশক্তির আর একটি বিশেষ ধারা বিন্যস্ত তাঁর বহুবিচিত্র ছন্দ-সৃষ্টিতে। ছন্দগুলির নামকরণও তিনিই করেছেন। ছন্দের নামকরণের বৈচিত্র্য ও মাধুর্য বিশেষ লক্ষণীয়। যথা, বীর বিলাসিনী, তরঙ্গলহরী, প্রকৃতি, রণ-রঙ্গিণী, সুরঞ্জিকা, উন্মাদিনী, মোহিনী, পঞ্চাল, সুধা-তরঙ্গিণী, মালতীমালা, চপলাগতি, আমোদিনী, শামক, শেফালিকা, হিল্লোল, স্বেচ্ছা প্রভৃতি। কবির উদ্ভাবনীশক্তি বিশেষ আকর্ষণীয় প্রশংসায় উদ্ভাসিত। প্রকৃতপক্ষে, স্বভাব-বর্ণনে যেমন কবিকঙ্কন, পরমার্থকালী বিষয়ে যেমন কবি-রঞ্জন, আদিরসে যেমন রায়গুণাকর, তেমনি হাস্যরসে ঈশ্বর গুপ্ত। তিনি অন্যান্য রস বর্ণনার বিষয়ে অন্যান্য বিদগ্ধ কবিদের মত সমান পারদর্শিতা দেখাতে পারলে বাঙ্গালা দেশে কবিকুলচূড়ামণি হতেন সন্দেহ নেই। এ মত শুধু আমারই নয়, সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও এই মতের পরিপোষক। বস্তুতঃ কবি ঈশ্বরচন্দ্রের কবি-প্রতিভা ছিল সহজাত, আর এই প্রতিভার সঙ্গে যদি ঠিক সেই পরিমাণ শিক্ষার 'পার্বতী-

পরমেশ্বর' মিলন ঘটত, তবে রচনাধিক্য ও রচনাগুণে তিনি শুধু উত্তরকালের বাংলাসাহিত্যের কেন, যুগান্তরের কবি-কুলশিরোমণি হয়ে সর্বযুগের সাহিত্যপথ-পথিকের সপ্রশংস, সবিস্ময় ও সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন, এ'বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। কারো কারো মতে তিনি যুগের কবি, যুগোত্তীর্ণ নন, তবুও আজকের যুগে এই গুপ্তকবির কাব্যালোচনা ও কবির ব্যক্তিস্বরূপের পরিচয় জানার বিশেষ প্রয়োজন ও তাৎপর্য আছে। সে-যুগের কবি হলেও কবির রচনার আবেদন ও উপযোগিতা যে আজকের যুগেও সমান আছে, তীব্র হয়েছে এর মূল্যরূপ, তাতেই প্রমাণ করে গুপ্তকবি যুগের হয়েও যুগোত্তীর্ণ, স্বদেশের হয়েও সার্বজনীন, স্বজাতির হয়েও মানবমহিমার অন্যতম প্রধান ঋত্বিক ও প্রচারক। এখানেই গুপ্তকবি 'কবি' হিসেবে সম্পূর্ণ, সার্থক ও সিদ্ধ।

গ্রন্থাবলী

প্রথম খণ্ড।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত।

শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত সম্পাদিত

কলিকাতা
২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত
১৮ [illegible]

[মূল্য ৪৲ চারি টাকা মাত্র]

ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য

কবি ঈশ্বর গুপ্ত বাংলাসাহিত্যের নবযুগের জন্মদাতা। তাঁকে যে অবস্থায় সাহিত্যব্রতে আত্মনিয়োগ করতে হয়েছিল তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সে সময়ে বাংলা সাহিত্য রামায়ণ, মহাভারতের বাংলানুবাদ, বৈষ্ণবপদাবলী, মঙ্গলকাব্য ও দাশু-রায়ের পাঁচালীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৮১৮ সাল থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, আজ পর্যন্ত বাংলাসাহিত্য প্রধানত গড়ে উঠেছে সাময়িক পত্রিকার মাধ্যমে। এর প্রথম যুগে সমাচার দর্পণ, সংবাদকৌমুদী, সমাচার চন্দ্রিকা, বঙ্গদূত ও সংবাদ-প্রভাকর সাহিত্যের উন্নয়নে অজস্র সহায়তা করেছে। এই সকল সাময়িক পত্রিকার মাধ্যমেই গদ্যসাহিত্যের বুনিয়াদ গড়ে তুললেন রাজা রামমোহন, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তখন বাংলা সাহিত্যে বৈদেশিক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। ইংরাজী কাব্য ও সাহিত্যরসের প্রভাব সে সময়ের বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকাদের চিত্তে কিরূপভাবে পরিবেশন করা হত তা সঠিক জানা যায় না, তবে সাহেবিয়ানার প্রবেশ লক্ষ্য করে কবি খাঁটি বাংলাভাষায় বাংলা-ভঙ্গিতে বলেছেন :

যত কালের যুবো যেন সুবো
ইংরাজী কয় বাঁকা ভাবে
ধোরে ওরু পুরুত মারে জুতো
ভিখারী কি অন্ন পাবে॥

বিশেষতঃ কাব্যরস প্রচারের জন্য ইঙ্গবঙ্গ মিশ্রিত একপ্রকার

ভাষার আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল এবং এই সকল রচনা সম্পূর্ণ প্রাচীন ধরনের ছিল না, অনেক পরিবর্তন হয়েছিল :

হারিয়া লইবে শশী করিয়া 'ফাইট' (Fight)
মনে এই ভাবিয়াছ হইলে 'নাইট' (Night)
কেড়ে লবে আমাদের চাঁদের 'রাইট' (Right)
চলেছে নতুন কাল জেবলেছে 'লাইট' (Light)

এই বিরাট পরিবর্তনশীল রচনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর গুপ্ত বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেন। ঈশ্বর গুপ্ত খাঁটি বাংলা দেশের কবি, এজন্যই তিনি চিরস্মরণীয়। তাঁর সাহিত্য-জীবন আলোচনা করলে বাংলাদেশের সাহিত্যের মূলসূত্র খুঁজে পাই। ঈশ্বর গুপ্তের ব্যক্তিত্ব নানাদিক থেকে অতুলনীয়। প্রায় ২০ বৎসর তিনি বাঙগালীর সর্বাপেক্ষা প্রিয়কবির মর্যাদা পেয়েছেন। আধুনিক গীতিকাব্য তখনও দেখা দেয়নি, তা' সত্ত্বেও কাব্যের ব্যঙগবিদ্রূপ, উপদেশদানে, বাস্তব দৃষ্টঘটনা ও লোকচরিত্র বর্ণনায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। ঈশ্বর গুপ্ত স্বাধীনজীবী ছিলেন, সাহিত্যচর্চা ছাড়া তাঁর আর কোন পেশা ছিল না। সেকালে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি সাহিত্যকেই একমাত্র পেশা মনে করে' জীবনযাত্রানির্বাহ করেছেন, এদিক থেকেও তিনি প্রথম পথিক। সরস্বতী যে ক্রমশ তার জীর্ণাসন ত্যাগ করে কমলার নতুন, সুন্দর ও ঐশ্বর্যময় আসন অধিকার করেছেন, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমরা কবি ঈশ্বর গুপ্তে দেখতে পাই। আজকের যুগে বহু সাহিত্যিকের অবলম্বন অনেকটাই এই সরস্বতী-কমলার যুগ্মপ্রসাদ তথা সাহিত্য-জীবিকা। কবি ঈশ্বরচন্দ্র স্বীয় প্রতিভা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার গুণে জনসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, সাহিত্যসাধনা ছাড়াও 'সংবাদ-রত্নাবলী' নামে একটি পত্রিকার সম্পাদনার ভার স্বহস্তে গ্রহণ

করেন। এর কিছুদিন পর কবি ঈশ্বরচন্দ্র দেশভ্রমণে ও তীর্থ-ভ্রমণে যান। ফিরে এসে তিনি ঠাকুর বাড়ীর সহায়তায় 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশ করতে থাকেন। এই পত্রিকা দুইদিন অন্তর প্রকাশিত হত। ১৮৫৩ সাল থেকে ঈশ্বর গুপ্ত প্রতি মাসে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন—এতে গদ্য, পদ্য, প্রভৃতি নানা বিষয়ের প্রবন্ধ স্থান পেত। এই কাগজেই তিনি প্রাচীন কবিওয়ালা ও আখড়াইদের জীবনী ও গীতি প্রকাশ করেন। এর কিছুদিন পর প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাদের পুনর্বিবাহের জন্য পুস্তিকা প্রকাশ করেন; কবি ঈশ্বরচন্দ্র এই প্রথাকে ব্যঙ্গ করে নানা কবিতা লিখে পাঠকদের বিশেষভাবে বিরুদ্ধমতাবলম্বী পাঠকদের চিত্তরঞ্জন করেন—

বিদ্যাসাগর নাহি তথা। কে কবে বিয়ের কথা॥
বিয়ে হলে বেঁচে যেত। সাধপুরে খেতে পেত॥
গহনা উঠত গায়। এড়াতো সকল দায়॥

এর পর ১২৫৩ সালে তিনি 'পাষণ্ডপীড়ন' নামে একখানা পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার সঙ্গে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'রসরাজ' পত্রিকার কবিতার লড়াই হয় এবং মাস দুই পরে দু'খানি পত্রিকাই বন্ধ হয়ে যায়। এতে হতাশ না হয়ে ১২৫৪ সালে ঈশ্বর গুপ্ত 'সাধুরঞ্জন' নামে একখানি পত্রিকা সম্পাদনা সুরু করেন। সম্পাদকীয় কাজ ছাড়াও তিনি কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বহু সভা-সমিতিতে (যথা প্রকাশরঞ্জনী ও বঙ্গভাষা রঙ্গণী) কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ করে জনসাধারণের আনন্দদান করতেন। কবি ঈশ্বরচন্দ্র নিজেও মফঃস্বলে কয়েকটি সাহিত্যসভার সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। তার মধ্যে তত্ত্ববোধিনী সভা, টাকীর নীতি তরঙ্গিণী

সভা প্রভৃতি উল্লেখ্য। বহু সভায় তিনি সসম্মানে আমন্ত্রিত হতেন। আজকের বহু সামাজিক অনুষ্ঠানে বা সভা-সমিতিতে যে সাহিত্যিকদের আমন্ত্রণ জানান হয়, তার প্রথম নিদর্শন আমরা ঈশ্বর গুপ্তে দেখতে পাই এবং ঐজাতীয় আমন্ত্রণের তিনিই বোধ করি প্রথম প্রাপক ও বাহক। সাহিত্যিকের পদ-মর্যাদা তাঁর সময় থেকেই ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকে এবং সামাজিক স্বীকৃতিও লাভ করতে থাকে। এখানে গুপ্তকবির কয়েকটি কবিতার উদাহরণ দেওয়া গেল।

উড়ন্ত ফানুস দেখে কবি আটপৌরে ভাষায় ব্যক্ত করেছেন :—

কেহ বলে দেখা যাবে এইখানে রই।
কেহ বলে এতক্ষণে হল চাঁদ সই॥
হেলেদুলে নেচেনেচে চলে থরে থরে।
মহাবেগে উঠিয়াছে মেঘের উপরে॥
উড়িয়াছে আকাশেতে সুচারু ফানস।
তাহাতে মানুষ বসে প্রফুল্ল মানস॥
সাবাস সাহস তার কিছু নাই ভয়।
যত উঠে তত মনে সুখের উদয়॥

নিদারুণ গ্রীষ্মের কষ্ট বর্ণনা করতে গিয়ে কবি লিখেছেন—

দিশিপাতি নেড়ে যারা তাতে পুড়ে হয় সারা
'মলাম, মলাম, মামু' কয়।
'হ্যাঁদু বাড়ী খানু ব্যাল, প্যাটেতে মাখিনু ত্যাল,
রাতি তবু নিদ্ নাহি হয়॥'

ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন অতিবাস্তববাদী কবি। তিনি ছিলেন অশেষ গুণসম্পন্ন। সমাজসংস্কার ব্যাপারে তিনি রক্ষণশীল মত পোষণ করতেন। তাঁর রচনার বহুস্থানে অশ্লীল বা

অসংযত ভাষা হয়ত ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু সেগুলির মধ্যেও সুস্পষ্ট মানবপ্রেম ও বাংলাভাষার প্রতি অসীম অনুরাগ ও অকৃত্রিম ভক্তি প্রকট হয়েছে। কাব্যে পরিহাস পরিবেশনের জন্য তিনি একজন শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী কবি বলে গণ্য হয়েছেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগে যে খাঁটি বাঙ্গালীভাব বাংলা কবিতার সর্বাঙ্গে জড়িত ছিল ঈশ্বর গুপ্ত তার শেষ প্রতিনিধি। তিনি সেকালের শেষ ও একালের সূচক। ঈশ্বর গুপ্ত বাল্যে গ্রামের পাঠশালায় সামান্য লেখাপড়া করেন, কিন্তু খেলাধুলায় ও মুখে মুখে পদ্য রচনায় তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। কথিত আছে, ১৭।১৮ বছর বয়সে দেড়মাসের মধ্যে তিনি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা মহেশচন্দ্রও একজন স্বভাবকবি ছিলেন। কৈশোরে নাকি ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর সঙ্গে কবির লড়াই করতেন। সহজাতপ্রতিভার প্রকাশ কবির বাল্যেই প্রস্ফুটিত হয়ে উঠে। এই প্রতিভার পরিণত রূপ 'সংবাদ-প্রভাকর' প্রকাশ ও সম্পাদনায়। সংবাদ-প্রভাকরই বাংলাদেশের প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র এবং ঈশ্বর গুপ্তই বাংলাদেশের দৈনিক পত্রিকার প্রথম সাংবাদিক। আমরা ঈশ্বর গুপ্তকে যুগস্রষ্টা হিসাবে পূজা করি, সাহিত্যিক ঈশ্বর গুপ্তকে সাহিত্যক্ষেত্রে মানবতার প্রথম পূজারী বলে অভিনন্দন জানাই। কিন্তু সাংবাদিক ঈশ্বর গুপ্তেরও সংবাদপত্র জগতে বিরাট অবদানের কথা সব সময়ে স্মরণ করি না। আজকের সংবাদ-জগতে বিদগ্ধ ও জ্ঞানীগুণীর কলকাকলীর অভাব নেই; কিন্তু সেই প্রথম প্রভাতের স্নিগ্ধ বিহঙ্গ-কূজনটি কোনক্রমেই ভুলবার নয়। তাই সংবাদ প্রভাকরের চরাচর ব্যাপ্ত প্রতিভাকে আজ নূতন করে স্মরণ করতে হবে। মানুষের হৃদয়ের সকল সময়ের সকল ভাবের অবস্থাকে তিনি রূপদান করতেন কাব্যে,

সব সময় তা' সুরুচিসম্মত হয়তো হতো না, তবু এ'সকল ত্রুটিসত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর নাম চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে তাঁর হৃদয়বত্তা, চরিত্র-মাধুর্য এবং দেশ-প্রেমের জন্য। তাঁর কীর্তির চেয়ে তিনি ছিলেন মহৎ। গুপ্ত কবির দেশ বাৎসল্য কিরূপ তীব্র ও বিশুদ্ধ ছিল তা' তাঁর দেশ-প্রেমমূলক কবিতাগুলির অনুশীলনেই বোঝা যায়। ঈশ্বর গুপ্তের মহৎ কীর্তির আর একটি প্রমাণ তাঁর ধর্মমতের উদারতা আন্তরিক অভিব্যক্তি। তিনি আদিব্রাহ্মসমাজভুক্ত হয়েও মহাকালীর স্তব রচনা করেছিলেন:

শাস্ত্রে শাস্ত্রে তর্ক হয় কতজনে কত কয়
কিছু নয় সে সব বিচার।
জননী জনমভূমি ঈশের ঈশত্ব তুমি
একবস্তু সকলের সার॥

দৈনিক পত্রিকার দায়িত্ব আংশিকভাবে অপরের উপর দিয়ে তিনি মাসিক পত্রিকার উপরই অধিকতর মনোযোগ দেন এবং সঙ্গে 'প্রবোধ প্রভাকর', 'হিতপ্রভাকর' ও 'বোধেন্দু-বিকাশ' নামক তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ঈশ্বর গুপ্ত প্রতি বছর দুর্গাপূজার পর দেশভ্রমণে বেরুতেন এবং এই ভ্রমণ ব্যাপদেশে দেশের সকল গণ্যমান্য নেতাদের সঙ্গে মিলিত হতেন ও সাহিত্য আলোচনা করতেন। এভাবে সময়ের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেও রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, রামনিধি গুপ্ত, হরুঠাকুর, নিতাই বৈরাগী এবং আরো অন্যান্যদের জীবনী-সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন। তিনিই বাংলা দেশে সর্বপ্রথম নববর্ষ উৎসবের প্রচলন করেন (১২৫৭ সন ইং ১৮৫১ সালে)।

অত্যধিক পরিশ্রম ও মস্তিষ্ক-চালনার ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে; কিন্তু এর মধ্যেও তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। মঙ্গলাচরণ ও কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ করার পরই তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গদ্যেপদ্যে সমান দক্ষ ছিলেন, তবুও তাঁর গদ্যরচনার প্রতিভা অপেক্ষা পদ্যরচনা—তথা সাহিত্যপ্রতিভা অপেক্ষা কাব্যপ্রতিভা প্রখর ছিল। তাই বোধ-করি ঈশ্বরচন্দ্র কাব্য-রচনায় প্রতিভার উৎকর্ষ দেখিয়েছেন। খাঁটি বাংলা কথায়, খাঁটি বাঙ্গালীর মনের ভাব একমাত্র ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যেই প্রতিভাত ও পরিলক্ষিত হয়। 'মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি—ঈশ্বর গুপ্ত বাংলার কবি। যা' আদর্শ, যা' কমনীয়, যা' আকাঙ্ক্ষিত, তা' যেমন কবির সামগ্রী, তেমনি যা' প্রকৃত, যা' প্রত্যক্ষ, যা' প্রাপ্ত তাও কবির সামগ্রী। তাতেও প্রকৃত রস আছে, সৌন্দর্য আছে। কবি ঈশ্বর গুপ্ত সেই রসে রসিক, সেই সৌন্দর্যের কবি।'

ঈশ্বরচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র, রঙ্গলাল, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতির গুরু। ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েও এই সকল প্রতিভাবান তরুণেরা ঈশ্বরচন্দ্রের আদর্শে সাহিত্যসেবা সুরু করেন, গুপ্তকবির এ এক অলোকসামান্য প্রভাব। তিনি 'প্রভাকর' পত্রিকায় নানা প্রকার দেশাত্মবোধক কবিতা রচনা করে বাংলায় যে নবজাগরণের সূচনা করেন, সে প্রভাব আজও প্রসারিত। বাংলা সাহিত্যের তিনি শুধু যুগান্তকারী কবিই নহেন, তাঁর রচনার বিষয় বস্তুতেও নিত্যনূতন ও সময়োপযোগী বিষয় যেমন 'সব হ্যায় ফাঁক', 'খল-নিন্দুক', 'নির্গুণ ঈশ্বর', 'নীলকর', 'দুর্ভিক্ষ' প্রকৃতির সূচনা

হয়েছিল। কবির রচনাগুলির শিরোনামাও কিরূপ বৈচিত্র্যময় এবং আকর্ষণীয়।

সুখে-দুঃখে, আনন্দে-উৎসবে আজও আমরা গুপ্তকবির ব্যঙ্গরচনার দু'চার পংক্তি (লাইন) আবৃত্তি করে' কৌতুক ও রস উপভোগ করি। আজকের দিনেও ব্যঙ্গ কবিতা রচিত হচ্ছে, কিন্তু গুপ্তকবির মত কেউই সরল প্রাণ ও বাস্তববাদী রচয়িতা নন।

তাই সাহিত্য-তীর্থ বাংলাদেশে, সামান্য পল্লীবাসী কবির সাহিত্যও যথার্থ কাব্য-প্রতিভায় আলোকিত হয়ে রসিকের মানসাকাশে চিরভাস্বর শুকতারার মত স্নিগ্ধ, সুন্দর, প্রশান্ত নীলিমায় শোভা পাবে; গৌড় সুভাজনের কেউ কুড়িয়ে নেবেন সৌন্দর্য, কেউ দীপ্তি, কেউ বা সমগ্র কাব্য তথা কবি-সৃষ্টি-পুষ্পটির স্নিগ্ধরসসৌরভ। ঈশ্বর গুপ্তের সৃষ্টি-সম্ভার এ'দাবী অনায়াসেই করতে পারে, কারণ এ'দাবী শুধু যথার্থই নয়, যুক্তিযুক্ত এবং বাঞ্ছনীয়। এ'দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার না করা মানেই সত্যের অপলাপ করা এবং বাঙ্গালী হয়ে চির-অকৃতজ্ঞতার গ্লানি বহন করা। কেননা ঈশ্বর গুপ্ত শুধু বাংলা সাহিত্যেরই কবি নন, পরন্তু সমগ্র বাঙ্গালী জাতির কবি, সমগ্র বাংলার কবি।

ঈশ্বর গুপ্তের জীবন-দর্শন

এবার আমি ঈশ্বর গুপ্তের জীবন-দর্শন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব। এতদিন সাধারণ পাঠক কবি ঈশ্বর গুপ্তকে একজন কবি বলেই জেনেছেন। কিন্তু কবি ঈশ্বর গুপ্তের যে একটি গভীর ও তাৎপর্যময় জীবন-বেদ আছে, তার সম্পর্কে তেমন ধারণা খুব কম লোকেরই আছে বোধ করি। এই নিবন্ধে তাই কবি ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনের একটি বিশেষ দিকের কথা বলব, একটি বিশেষ আদর্শ ও জীবন-অভীপ্সার দিকে আলোকপাত করব, যা তাঁর কবি জীবনের অন্য একটি নূতনতর অধ্যায়—তাহলো সাধক ঈশ্বরচন্দ্র—ভগবৎপ্রেমিক ঈশ্বরচন্দ্র—অধ্যাত্ম-রসিক ঈশ্বরচন্দ্র। কবি ও সাধক, কবি ও ঋষি এখানে এক হয়ে গেছেন। সেজন্য ঈশ্বর গুপ্ত শুধু কবিই নন, তত্ত্বদর্শী কবি, সত্যদ্রষ্টা, আত্মদ্রষ্টা কবি, এককথায় ক্রান্তদর্শী।

বিখ্যাত অভিধানকার অমরু "কবি" শব্দের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে লিখেছেন :

"বিদ্বান বিপশ্চিদ্দোষজ্ঞঃ সন্ সুধীঃ কোবিদঃ বুধঃ।
ধীরো মনীষীজ্ঞঃ প্রাজ্ঞঃ সংখ্যাবান্ পণ্ডিতঃ কবিঃ॥

(২-৫)

অর্থাৎ যিনি বিদ্বান, সুধী, ধীর, মনীষী, প্রাজ্ঞ ও পণ্ডিত, তিনিই 'কবি' পদবাচ্য। ঈশ্বরচন্দ্র এই শাশ্বত অর্থেই কবি। কবি ঈশ্বরচন্দ্রের এই বিশেষ পরিচয়ের বাণীরূপ রচনাই এই প্রবন্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

আপাতদৃষ্টিতে ঈশ্বর গুপ্ত বিশেষভাবে বাস্তববাদী হলেও, তিনি ছিলেন আদর্শবাদী। শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক অনুভূতিও তাঁর ছিল। তাঁর রচনার বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে নৈতিক ও পারমার্থিক বিষয়ক কবিতাবলী। তাঁর বাস্তববোধ ও তৎসঞ্জাত বাস্তববাদ কবির আধ্যাত্মিক অনুভূতিরই অন্যতম ফলশ্রুতি মাত্র। উপনিষদের বাণী তাঁর অন্তরে বিশেষ ধারণার সৃষ্টি করেছিল, যার জন্য তিনি পার্থিব সকল বস্তুকেই সমান মর্যাদা দিতেন, সমস্ত বস্তুতে ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করতেন, তাঁর কাব্যেও তারই অনুরণন দেখতে পাই। বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত মাধুর্য বিশ্লেষণ করে বা কখনো তার হেয় দিকটিকেই আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে কবি তাঁর এই অতীন্দ্রিয়-অনুভূতির নিদর্শন রেখে গেছেন। কবির এই জাতীয় অপূর্ব আধ্যাত্মিক সম্পদসমৃদ্ধ রচনাগুলি কিন্তু সাধারণ্যে তেমন পরিচিত নয়। এই অপূর্ব রচনাগুলিই কবির প্রজ্ঞার প্রসাদ —কবির "ধেয়ানের ধন," জীবনবেদের নিশ্রুক্তি। কবি ঈশ্বর গুপ্তের মূলতঃ দুই স্বরূপ—এক হলো তাঁর কাব্যের বাস্তব রস তথা বাস্তবগ্রাহিতা বা বস্তুতান্ত্রিকতার দিক, আর একটি আধ্যাত্মিক বা তন্ময়তার দিক। উভয়দিকের মধ্যে আপাতবিরোধ বা বৈসাদৃশ্য মনে হলেও উভয়ে উভয়ের পরিপূরক।

কবি-স্বরূপের এ দুটি দিককেই জানতে হবে তবেই ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে জানা যথার্থ হবে। কবির আধ্যাত্মিক অনুভূতির এদিকটিকে উপেক্ষা করলে কবির বস্তুরসবোধ ও বাস্তববাদকে সম্যক উপলব্ধি করা যাবে না, সেজন্যই তাঁর কাব্যের নিগূঢ়তম রস আস্বাদন করতে হলে, কবিকে যথার্থ বুঝতে হলে, কবির প্রকৃত জীবন দর্শন তথা জীবন-বেদ ও

জীবন-বোধ তথা জীবন-বাদকেও আমাদের পূর্ণভাবে বুঝতে হবে।

বস্তুতঃ ঈশ্বর গুপ্তের জীবন-দর্শন ঈশ্বরপ্রেম ও ঈশ্বর-নির্ভরশীলতার জীবনদর্শন। ভারতের প্রাচীন ঋষিদের কণ্ঠে যে মন্ত্র একদিন ঊষালগ্নে পুণ্যবনভূমিতে উচ্চারিত হয়েছিল—

"একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি।"

(ঋগ্বেদ ১-১৬৪-৪৬)

সেই এক, সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এর মন্ত্র, সেই এক ঈশ্বরকেই করেছিলেন কবি তাঁর জীবনের একমাত্র ধ্রুবতারা, একমাত্র পরাৎপর বস্তু। তাঁর "বিভুর পূজা" শীর্ষক কবিতায় তিনি লিখেছেন :

"জয় জয় জগদীশ জগতের সার।
সকলি অসার আর সকলি অসার॥"

ঈশ্বরের অন্যান্য গুণরাশির বর্ণনা তাঁর "অকারাদ্য ঈশ্বর স্তুতি" ও "আকারাদ্য ঈশ্বর স্তুতি" নামক দুটি অনুপ্রাস বহুল কবিতায় পাওয়া যায়। যেমন :

"অনাদি অনন্ত অজ অজর অক্ষর।
অক্ষয় অভয় অতি অজয় অমর॥"
"আদিহীন আদিনাথ আদি সবাকার।
আশু শিবকারী আত্মা আপনি আমার॥"

কবি ঈশ্বর গুপ্ত এ'ভাবে আমাদের শাস্ত্রোক্ত (ধর্ম ও দর্শন) প্রায় সমস্ত ঐশ্বরিক গুণ ও শক্তি এই "অকার" এবং "আকার" যুক্ত শব্দের সাহায্যে অনবদ্যভাবে প্রকাশ করেছেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদের ঋষি বলেন—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি, তদ্ বিজিজ্ঞাস্ব, তদ্ ব্রহ্ম।" (তৈত্তিরীয় উপনিষদ ৩-১-১)

অর্থাৎ তিনিই ব্রহ্ম—যাঁর থেকে সৃষ্টির এ'সকল বস্তু উৎপন্ন হয়েছে, যাঁর শক্তিতে স্থিতিকালে এ'সকল বস্তু প্রাণ পেয়েছে, এবং অন্তে বা প্রলয়কালে যাঁর মধ্যে সকল বস্তুই প্রবেশ লাভ করবে। মোটকথা, ঈশ্বরই এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয়ের একমাত্র কারণ। কবি ঈশ্বরচন্দ্রও শ্রীভগবানের সৃষ্টি ও সংসার-লীলা নিরন্তর জগতে সর্বত্র প্রত্যক্ষ করেছেন, তাই ভাব-বিহ্বল হয়ে বলেছেন :

"প্রণাম তোমায় প্রভু প্রণাম আমার।
এখনি সৃজন করি, এখনি সংসার।
তোমার অনন্ত লীলা বুঝে সাধ্য কার॥
এই দেখি এই আছে, এই নাই আর।
প্রণাম তোমায় প্রভু প্রণাম আমার॥"

ভারতীয় মত হলো ঈশ্বর উপাদান এবং নিমিত্তকারণ দুইই, এবং সেজন্য তাঁর পরিব্যাপ্তি ও অবস্থিতি বিশ্বচরাচরের অণুতে পরমাণুতে অনুস্যূত হয়ে আছে। শ্রুতি বলেন :

"তদাত্মানং স্বয়মকুরত।"

অর্থাৎ ভগবানই নিজেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপে সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু ভগবান জগতের মধ্যেই আবার জগতের বাইরেও অবস্থান করছেন। যেহেতু একটি ক্ষুদ্র জগৎ আমাদের এই পৃথিবী, তাঁর বিরাট অচিন্ত্যনীয় সমগ্র সভা ও স্বরূপ প্রকাশ করতে সক্ষম নয়, সেজন্য পূর্ণ ব্রহ্মের সত্তা জগতকে পূর্ণভাবে বিবৃত করলেও সুদূরের পিয়াসী, অনন্তপ্রসারী। তাই ব্রহ্ম সাকার হয়েও নিরাকার। কবি এই তত্ত্বটি অতি সুন্দরভাবে বলেছেন তাঁর কবিতায় :—

"আকার স্বরূপ কিন্তু নাহিক আকার।
আবার আকারে ব্যাপ্ত আছ সবাকার॥

আশ্চর্য আকারে আছ অখিল আকারে।
আদর্শস্বরূপ রূপ আকারে আকারে॥
আকার আকর তুমি আধিপত্য কত।
অদৃশ্য অথচ আছ আভাসের মত॥
(আকারাদ্য ঈশ্বরস্তুতি।)

কবি ঈশ্বর গুপ্তের দর্শনের মৌলভিত্তি আমাদের ভারতীয় দর্শন, সেজন্য অবতারবাদের তত্ত্বও কবির রচনায় বিধৃত হয়েছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মর্মবাণী "সম্ভবামি যুগে যুগে" কবির রচনায় একই সুরে ছন্দিত হয়েছে:

অনির্বচনীয় অবয়বে অবতার।
অখিল অনাথনাথ অতি চমৎকার॥
অপরূপ অবয়ব নানা অবতারে।
অদ্ভুত অবস্থা অবলম্ব বারে বারে॥"
(অকারাদ্য ঈশ্বরস্তুতি)

জগতের সর্বত্র একমাত্র ঈশ্বরকেই যিনি দেখছেন, সর্ববস্তুতে যিনি সেই একমাত্র ঈশ্বরেরই অবস্থিতি লক্ষ্য করছেন, তিনিই তো প্রকৃত সাধক, প্রকৃত উপাসক, সত্যদ্রষ্টা ঋষি। উপনিষদের ঋষির মত তিনিই উপলব্ধি করেন—"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"।
(ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ৩-১৪-১)

একদিক থেকে দেখতে গেলে জগৎ ব্রহ্ম থেকে পৃথক, জগৎ মিথ্যা বা মায়া মনে হয়। আবার অন্যদিক থেকে দেখতে গেলে জগৎ ব্রহ্মময়, ব্রহ্ম ছাড়া জগৎ নেই, জগৎ ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। এ হলো নঞর্থক ও সদর্থক দার্শনিক বিচার। প্রথমোক্ত দার্শনিক মতবাদকেই আচার্যশ্রেষ্ঠ শঙ্কর তাঁর বিখ্যাত "মোহমুদ্গর" রচনায় প্রমূর্ত করেছেন। আবার আর একশ্রেণীর দার্শনিক ও ভক্তসাধক তাঁরা পার্থিব সকল বস্তুতেই

ঈশ্বরত্বের আরোপ বা পরমব্রহ্মের অবস্থান উপলব্ধি করেছেন। এই শ্রেণীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাধক ও প্রবক্তা হলেন এ'যুগের যুগাবতার পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ।

কবি ঈশ্বর গুপ্তও যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ছিলেন—একথা অনেকেই জানেন না; কবির রচনাংশের নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটি আচার্য শঙ্করের মতের পরিপোষক প্রথম দিকে, আবার শেষের দিকে দ্বিতীয় মতের অনুগামী। অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় এই উভয় দার্শনিক মতবাদেরই কবির রচনায় এক অপূর্ব ভাব-সমন্বয় ঘটেছে (Assimilation of ideas doctrines)। কবি প্রথমে জগতের অসারত্ব নিয়ে আরম্ভ করে শেষ করেছেন জগতের ব্রহ্মময়ত্বের মধ্যে। ব্রহ্ম ব্যতীত সবই "অসার", সবই "ফাঁক", সবই ''কিছু নয়'' মনে হবে:—

"সকলি অসার আর সকলি অসার।
চিদানন্দ সদানন্দ একমাত্র সার।
"দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাঁক,
বাবা সব হ্যায় ফাঁক।
ধনের গৌরবে কেন মিছা কর জাঁক,
বাবা মিছা কর জাঁক॥"
''দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়,
বাবা কিছু কিছু নয়।
নয়ন মুদিলে সব অন্ধকারময়,
বাবা অন্ধকারময়॥"

যে সংসারকে সামান্য দৃষ্টিতে অসার বা অনিত্য বলে মনে হয়, ভূমাদৃষ্টিতে সেই সংসারকেই সারবস্তু, নিত্য ব্রহ্ম মনে হবে:

"ব্রহ্মরূপ সমুদয় ব্রহ্মছাড়া কিছু নয়,
ব্রহ্মময় অখিল সংসার।"

কবি ঈশ্বর গুপ্ত তাই সাধারণ সংসারাসক্ত ঈশ্বর বর্জনকারী মানুষকে সাবধানবাণী শুনিয়েছেন। ঈশ্বরকে অস্বীকার করে, তাঁকে বাদ দিয়ে সংসার নিয়ে মত্ত হলে যে অসীম দুঃখ মানুষকে ভোগ করতে হয়, সে কথা কবি তাঁর রচনায় কতকগুলি সুন্দর উপমার সাহায্যে বিকশিত করেছেন। কবি তাঁর কয়েকটি রচনায় সংসারকে কখনো "জাঁতা", কখনো "সমুদ্র", কখনো "অরণ্য" আবার কখনো "নাট্যশালা ও সাজঘর" বলে বর্ণনা করেছেন। কবি প্রত্যেক কবিতার শেষে সেই সকল মানুষকে সেই পরমেশ্বরের পাদপদ্মে শরণ নিতে উৎসাহিত করেছেন যারা নিষ্ঠুর সংসারচক্রে নিষ্পেষিত, উত্তাল-সংসার-সমুদ্রে নিমজ্জমান ভীষণ সংসারারণ্যে পথভ্রষ্ট, এবং ক্ষণস্থায়ী সংসার-নাটকের মিথ্যা সাজধারী মানুষ। কবি এদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন—

"অতএব শুন জীব প্রাপ্ত হবে নিজ শিব
হইবে অশিব সব গত।
মায়াজাল মুক্ত হও, সত্যের আশ্রয় লও,
ঈশ্বরের হও পদানত।"

আবার ঈশ্বরকে গ্রহণ করে সংসার করলে, ঈশ্বরকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করলে অর্থাৎ সংসারে স্বর্গপ্রতিষ্ঠা করতে পারলে, স্বভাবতই সংসারকে ঈশ্বরের লীলানিকেতন বলে মনে হবে, 'আর তাতে ঈশ্বরের আনন্দ, আলোক, অমৃত সৌন্দর্য ও মাধুর্যে'র মহিমময় প্রকাশ দেখতে পাওয়া যাবে। সেজন্য উপনিষদে দেখতে পাই:—

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসং কিন্তীতি।
(তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ৩-৬)

অর্থাৎ যা কিছু সৃষ্টি তা আনন্দ থেকেই, আনন্দেই তার স্থিতি, আবার আনন্দেই তার লয় হবে।

তেমনি ভগবতানন্দ-রস উপভোগ করে ধন্য কবি ঈশ্বর-চন্দ্রও স্থির প্রত্যয় নিয়ে বলেছেন—

"যদি না প্রকাশ পায় প্রতিভা তোমার।
জগৎ কি হতে পারে শোভার ভাণ্ডার?"

ভাব-বিভোর ও বিহ্বল-চিত্তে কবি তাই বলেছেন—

"কাজ নাই দরশন যাহা করি দরশন,
তাতেই মোহিত মন তব মহিমায়।
ধরা জল বহ্নি বাত, দিবা নিশি সন্ধ্যা প্রাত,
সকলই প্রতিভাত তোমার প্রভায়॥
যত কিছু রমণীয় যত কিছু কমনীয়,
সকলই শোভনীয় তোমার শোভায়।
প্রভাকর প্রভা-কর তুমি তার প্রভাকর,
নতুবা এ রবি-ছবি কোথায় লুকায়॥"

আর্য ঋষিরা বিশ্বের অন্তর্নিহিত আনন্দ ও অমৃতময় ধারাকে আবিষ্কার করে কৃতার্থ-চিত্তে বলেছেন—

"রসো বৈ সঃ। রসংহ্যেবায়ং লব্ধানন্দী
ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণাৎ।
যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।"

(তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ২-৭-১)

অর্থাৎ তিনিই (ঈশ্বরই) পরমরসস্বরূপ। তিনিই আনন্দ লাভ করেন যিনি এই ভূমা-রস আস্বাদন করেছেন। কেননা, যদি এই আকাশে আনন্দের অস্তিত্ব না থাকত, তাহলে কেই বা প্রাণ ধারণ করত?

কবি ঈশ্বর গুপ্তও এই কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন—

"আপনি আনন্দে আছ আপ্লাবিত হয়ে।
"আব্রহ্ম আনন্দে মত্ত যে আনন্দ লয়ে।"

এই দিব্যানন্দামৃত পান করে আর একজন বৈদ্য কবি সাধক রামপ্রসাদ ঠিক এমনিভাবেই বলেছেন—

আপনাতে মন আপনি থাক,
যেও নাকো কারো ঘরে।
যা, খোঁজ তাই খুঁজে পাবে
(যদি) খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥"...

ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে পারলে কর্তব্য অকর্তব্য এক হয়ে যায়, কোন ভেদ থাকে না। ক্ষুদ্র-বৃহৎ, তুচ্ছ বা সামান্য—মূল্যবান সব বস্তুই একস্বরূপে প্রতীয়মান হয়। এই ব্রহ্মোপলব্ধি-লাভে কৃতার্থ কবি বা সাধকের অবস্থাও কবি নিজেই কেমন সুন্দর ব্যক্ত করেছেন:—

কি কর্তব্য অকর্তব্য নাহি করি ধর্তব্য
ত্রিভুবন তৃণের সমান।
আপনি আপন বশ ব্রহ্মানন্দ সুধারস,
প্রতিক্ষণ সুখে করি পান॥
চেয়ে নাহি চক্ষু মেলি, নিজভাবে হাসিখেলি,
নাচি গাই আপনার ভাবে।
নাহি শোক নাহি রোগ, অবিচ্ছেদে সুখভোগ,
ভাব পেয়ে পেয়েছি স্বভাবে॥

কি অপূর্ব সুন্দর অভিব্যক্তি! সাধকের স্বভাবটি অনবদ্য বাণীরূপ লাভ করেছে কবির ভাষায়। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, ঈশ্বর যদি এ'ভাবে বিশ্বজগতের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকেন, আর জীবজগৎ যদি তাঁর নিত্য ও পূর্ণ আনন্দেরই লীলাক্ষেত্র হয়, তাহলে ঈশ্বর ও জীবজগতের মধ্যে সম্বন্ধের

প্রকৃতিটি কিরূপ? সব দর্শন ও ধর্মেরই একটি মূল সমস্যা হল—এই সম্বন্ধটি নিরূপণ করা। বিভিন্ন দার্শনিক এটিকে বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। কেউ ঈশ্বর ও জীবজগৎকে অভিন্ন, কেউ ভিন্ন, কেউ ভিন্নাভিন্ন ভাবে দেখেছেন, আবার অন্যদিক থেকে ঈশ্বর ও জীবের সম্পর্ককে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও ঘরোয়া রূপ দিয়ে রাজা-প্রজা, প্রভু-ভক্ত, পিতা-পুত্র, মাতা-সন্তান, পতি-পত্নী, প্রিয়-প্রিয়া, সখা-সখী বা সখা-সখার সম্পর্ক আরোপ করেছেন বিভিন্ন ভক্তেরা। কবি ঈশ্বরচন্দ্র এই সমস্যার অতি সহজ সুন্দর স্বাভাবিক সমাধান করেছেন। ঈশ্বর ও জীবের সম্পর্ক বিশ্লেষণে তিনি গভীর দার্শনিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। কারণ, অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ প্রভৃতি নিগূঢ় দার্শনিক মতবাদ ব্রহ্ম ও জীবের সম্পর্ক বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে যেসব উপমার আশ্রয় লন, তার অধিকাংশই আমরা গুপ্তকবির রচনাতেও দেখতে পাই। যথা—অদ্বৈতবেদান্তের বিখ্যাত উপমা হচ্ছে—মৃৎপিণ্ড ও মৃন্ময়ঘট, সমুদ্র ও জল-বিন্দু বা ঊর্মি, মঠাকাশ ও ঘটাকাশ, বিম্ব ও প্রতিবিম্ব প্রভৃতি। অর্থাৎ মৃৎপিণ্ড ও মৃন্ময়ঘট বাহ্যতঃ দুটি ভিন্ন বস্তু বলে মনে হলেও উভয়েই স্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন, কেননা উভয়ই মৃত্তিকা ছাড়া তো আর কিছু নয়, শুধু আকারে পরিবর্তন হয়েছে মাত্র।

তাই শ্রুতিতে দেখতে পাই—

"বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্।"

(ছান্দোগ্যোপনিষদ ৬-১-৪)

অর্থাৎ মৃত্তিকা থেকে সৃষ্ট হয়েছে 'ঘট', 'কুম্ভ', 'শরা', 'পাত্র' ইত্যাদি। এগুলি নামে ভিন্ন হলেও বস্তুতঃ একমাত্র মৃত্তিকাই সত্য।

এই তো গেল অদ্বৈতবাদের কথা। দ্বৈতবাদেব বিখ্যাত উপমা হল—দুই পাখীর উপমা। এটি ঋগ্বেদ ও উপনিষদেও পাওয়া যায়—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরণ্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি।"

(ঋগ্বেদ, ১-১৬৪-২০; মুণ্ডকোপনিষদ, ৩-১-১,
শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ, ৪-৭)

অর্থাৎ, দুটি পাখী একই বৃক্ষ আশ্রয় করে আছে। একজন মিষ্টফল আস্বাদন করে, অন্যজন তাই কেবল দেখে। পাখী দুটি সখাভাবাপন্ন, এদের সম্বন্ধ হচ্ছে দার্শনিক অর্থে পরমাত্মা ও জীবাত্মা। অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদের এই উপমা-গুলিকে কবি ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর রচনায় সুন্দর বিন্যস্ত করেছেন। ঈশ্বর ও জীবের অভিন্নত্বকে নিয়ে তিনি দৃঢ় প্রত্যায়িত রূপ দিয়েছেন :—

"আছি আমি, আর আমি রহিবনা মোলে।
যে তুমি সে তুমি রবে, আমি যাব চলে॥
কি হইবে, কোথা যাব, কি বলিতে পারি।
মিশাবে জলধিজলে, জলধির বারি॥"

"আমি কভু নই আমি এ আমির তুমি স্বামী,
তবে কেন মিছে আমি আমি হয়ে রইহে।
আমি আমি এই ভাষ, এ যে আমি চিদাভাস,
ভাসেতে মিশালে ভাস, আমি তবে কই হে॥"

* * *

"মিটে গেল আশা বাই, · থেকে আর কাজ নাই
আপনার দেশে যাই হয়ে রিপুজয়ী,
সমুদ্রের বিম্ব যাহা সমুদ্রেব বস্তু তাহা
মাটির নির্মিত ঘট, নহে মাটি বই রে॥"
"এই তুমি এই আমি, এক যদি হয়।
তুমি তুমি আমি আমি, ভেদ নাহি রয়।"

* * *

আমায় না জেনে আমি 'আমি আমি' কই।
তুমি যদি স্বামী হও 'আমি আমি' কই॥
আমি 'আমি' নই ফলে, আর কেই নই।
জগদাত্মা পরমাত্মা তব সত্তা হই।
মাটির নির্মিত ঘট নহে মাটি বই।
সলিলের বিম্ব আমি সলিলেই রই॥

* * *

"'আমি' যদি 'তুমি' হই, আমার বিনাশ কই,
এ কথাটি কারে কই, কেবলে আমার।
ছিল শিব হল জীব, আছি জীব হব শিব,
এইরূপ জীব শিব আমায় তোমায়।
আমি আমি আমি তুমি জেন এই সার।
তুমি আমি এক হলে কেবা আর কার॥"

অতি সরল সহজ ভাষায় কবি কি অনবদ্যভাবে দর্শনের গূঢ় রহস্য ও তত্ত্বগুলি বিশ্লেষণ করেছেন! মানুষ যখন সংসারে থাকে, তখন জীব ও ঈশ্বর দুই ভিন্ন বস্তু বলে মনে হয়, যদিও দুই স্বরূপতঃ এক, ঈশ্বর লাভ হলে এ'সঙ্কীর্ণবোধটি আর থাকে না। জীব অজ্ঞানতাবশতই হোক, সংসারে মায়ামোহ-

জালে মুগ্ধ হয়েই হোক, ঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারে না, ফলে "বিজ্ঞানবোধ"এর অভাবে সংসারে অশেষ দুঃখ ও ক্লেশ পায়। কিন্তু পরমাত্মা বা ঈশ্বর এই দুঃখকষ্টের ঊর্ধ্বে, সব কর্ম-ফলের অতীত, সংসারের সব মায়াজাল ছিন্ন করে বীতমোহ। আমাদের কবি ঈশ্বরচন্দ্র দ্বৈতবাদের এই তত্ত্বটাকে সেই প্রসিদ্ধ উপমার সাহায্যে ঈশ্বর ও জীবের পার্থক্য বিশ্লেষণ করেছেন:—

"তুমি আমি দুই পাখী একগাছে বাস।
তোমার গোপনভাব না হয় প্রকাশ॥
খিচিমিচি করি আমি ডাকিয়া ডাকিয়া।
তুমি আছ সমভাবে নীরব হইয়া॥
এ প্রকার চমৎকার কব কার কাছে।
এমন আশ্চর্য নাকি আর কোথা আছে॥
বলহীন হইতেছি আমি খেয়ে ফল।
ফলভোগ না করিয়া তুমি পাও বল॥"

দর্শনের দিক থেকে তাই দেখি কবি ঈশ্বরচন্দ্র শুধু অদ্বৈত-বাদী নন, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। সাধারণ ভক্তিবাদীদের মত কবিও দুই মতের সমর্থক। সংসারে থেকে জীবকে ঈশ্বর থেকে আলাদা মনে হলেও জীব সব সময় ব্রহ্মময় বা ব্রহ্মস্বরূপ। আবার জীবকে ব্রহ্ম থেকে আলাদা মনে করে শুধু জীবত্ববোধ নিয়ে থাকাও ভুল, কারণ জীব শুধুই সাধারণ জীবত্ব নিয়ে থাকে না, পার্থিব একটা সংকীর্ণ সত্তা—শুধু তার পরিচয় নয়, সে পরিপূর্ণ প্রকৃত, শাশ্বত পরমার্থিক জীবসত্তাকে ধারণ করে চলে। সাধকের সাধনার চরম অবস্থায় এই বোধ হয়ে থাকে। তাই দেখা যায় সংসারাবস্থায় একরূপবোধ, সাধনার উচ্চতম মার্গে তথা মোক্ষাবস্থায় আর একরূপ প্রতীতি জন্মায়। তাই

ব্রহ্ম ও জীবজগৎ স্বরূপতঃ এক হলেও, বাহ্যতঃ ভিন্নস্বরূপ —ভক্তিবাদী বেদান্তের এই মতই হলো ঈশ্বর গুপ্তেরও মতবাদ। ঈশ্বর গুপ্ত আসলে ভক্তিবাদী সাধক ও কবি। দর্শনের এই ভেদাভেদমূলক বিষয়বৈচিত্র্যকে তিনি ধর্মের দিক থেকে বিচার করেছেন এবং ধর্মের দিক থেকে রূপ দিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধকে পিতা-পুত্রের সম্বন্ধের উপর স্থাপন করে তাকেই তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের মৌলভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছেন। একটা বৈশিষ্ট্য এখানে বিশেষ লক্ষণীয়। তা হলো আমাদের ধারণা সাধারণত পিতা-পুত্রের সম্পর্কের মধ্যে স্নেহ-মমতা, কোমলতার পরিবর্তে ভয় ও শ্রদ্ধার প্রাধিক্য থাকে, আর মাতা-তনয়ের সম্বন্ধে ভয় বা শ্রদ্ধার পরিবর্তে স্নেহ, মায়া, কোমলতার নিকটতর সম্পর্ক গড়ে উঠে। কিন্তু, ঈশ্বর গুপ্ত যদিও ঈশ্বর ও জীবের সম্পর্ক—পিতা ও পুত্রের সম্পর্কের সীমায় ও দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন, তথাপি তার মধ্যে আমাদের প্রচলিত ধারণার বিশেষ ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়া যায়। কবি তাঁর রচনায় পিতা ও পুত্রের যে সম্বন্ধের পরিচয় দিয়েছেন, তা কোন ভয় বা দূরের সম্বন্ধ নয় বরং তা নিকটতম মধুরতম স্নেহ ও প্রীতির সম্বন্ধ যা মাতা ও সন্তানের সম্বন্ধে দেখা যায়। সেজন্য গুপ্তকবি তাঁর রচনার দু'এক জায়গায় ঈশ্বরকে 'প্রভু' ও নিজেকে 'দাস', আবার অনেক স্থলে ঈশ্বরকে 'পিতা' ও নিজেকে 'পুত্র' বলে উল্লেখ করেও তিনি ঈশ্বরকে গ্রহণ করেছেন প্রিয়তম সখা, ঘনিষ্ঠতম সুহৃদ ও সহায় রূপে। আর এ'জন্যই দেখি তিনি নির্ভয়ে সেই বিশ্ব-জনয়িতার কাছে কখনো আবদার করেছেন, কখনো তাঁকে আদর করেছেন, প্রয়োজনবোধে তাঁকে ভর্ৎসনা করেছেন, তাঁর সঙ্গে কোন্দল করেছেন, কখনো মুখোমুখী আলাপ করছেন

তাঁর সঙ্গে, তাঁর কোলে বসে তাঁর প্রতি অভিমান করছেন, আবার অভিমানাহত হয়ে কেঁদেছেন,—এই সব প্রোজ্জ্বল 'আধ্যাত্মিকরস' স্নিগ্ধ চিত্রগুলি গুপ্তকবির রচনায় জীবন্ত হয়ে রয়েছে। বিশ্বপিতা ভগবানের সঙ্গে তিনিই এত ঘনিষ্ঠ, এত পরমাত্মীয়ের মত ব্যবহার করতে পারেন, যিনি সেই সর্ব-শক্তিমান পরমপিতার, নিজের অন্তরতর অন্তস্থলে আসন রচনা করেছেন। কবি ঈশ্বর গুপ্ত এই শ্রেণীরই সাধক, এই অধ্যাত্মপথের পান্থ—এই আনন্দামৃতলোকের অধিবাসী এমনি ভাবে অগ্রসর হয়ে পুত্র ঈশ্বর পিতা ঈশ্বরকে অভিমানক্ষুব্ধ সুরে 'কালা', 'কানা', 'বোবা' প্রভৃতি বলেছেন, কারণ তিনি সন্তানের কথা বা বক্তব্য কেন শোনেন না, তাঁর দুঃখকষ্ট কেন প্রত্যক্ষ করেন না, তাঁর বক্তব্যের প্রত্যুত্তরই বা কেন তিনি দেন না। পুত্রের ব্যাকুল আর্তিতে কেনই বা তিনি নীরব, নিথর হয়ে থাকেন। তাই কবি (পুত্র ঈশ্বর) পিতা ঈশ্বরকে খানিকটা আদর, খানিকটা অভিমান নিয়ে বলেছেন—

"কাতর কিঙ্কর আমি তোমার সন্তান।
আমার জনক তুমি, সবার প্রধান॥
বার বার ডাকিতেছি কোথা ভগবান্।
একবার তাহে তুমি নাহি দাও কান॥

* * *

হায় হায় কব কায়, ঘটিল কি জ্বালা।
জগতের পিতা হয়ে তুমি হবে কালা॥

* * *

অনুভবে বুঝিলাম, কালা তুমি বটে।
নতুবা কি আমাদের দুঃখ এত ঘটে॥

* * *

মুখ হয়ে মুখ নাই বিমুখ হয়েছ।
মূক হয়ে একেবারে নীরব রয়েছ॥"

পুত্র ঈশ্বর পিতা ঈশ্বরের উপর অভিমান করলেও তাঁকে সমান আদরও করেন। তাই তিনি পিতা ঈশ্বরকে একটি অতি আদরের নাম দিয়েছেন "হাবা আত্মারাম"।—

"কহিতে না পার কথা কি রাখিব নাম
তুমি হে আমার বাবা, 'হাবা আত্মারাম'।"

কবির বক্তব্যের নূতনত্ব যেমন লক্ষণীয় ও বৈশিষ্ট্যদ্যোতক, তেমনি যমক ও অনুপ্রাস অলঙ্কারের সুনিপুণ কুশলী প্রয়োগও চিত্তচমৎকার ও আর্কর্ণীয়। কবি শুধু ঈশ্বরের কাছে অভিমান করেই সন্তুষ্ট থাকতে চান না। তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে আরো আবদার, আরো জোর করার সাহস দেখিয়েছেন। যেহেতু ঈশ্বর তাঁর বক্তব্যে 'কান' দিচ্ছেন না, তিনি নীরব হয়ে থাকছেন, সেজন্য কবিরও জেদ যেন তিনি তাঁকে কথা বলিয়ে ছাড়বেন। কবির অন্যতম যুক্তি হলো তিনি ঈশ্বরে 'অস্তি' স্থাপন করে নাস্তিক্যবাদীকে 'নাস্তি'বাদ নিরসন করেছেন অর্থাৎ তিনিই নূতন করে ঈশ্বরকে সৃষ্টি করছেন। কাজেই তিনি যখন ঈশ্বরকে 'বাবা' বলেন, এবার ঈশ্বরেরও তাঁকে 'বাবা' বলা উচিত।

বস্তুতঃ সাধক সাধনার উচ্চমার্গে অগ্রসর না হলে, ঈশ্বরের সন্নিকটবর্তী না হলে, ঈশ্বরকে জীবনের ধেয়ানে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে এমন জোর বা আবদার করা যায় না, এমন আন্তরিকতামাখা সাহসও দেখানো সহজ হয় না। কবি নিজেই এই অবস্থাটির একটি সুন্দর রেখাচিত্র মাত্র কবিতার দুটি পংক্তিতে অঙ্কন করেছেন। এই কবিতাংশটি ঈশ্বর ও জীবের নিকটতম, মধুরতম ও সরলতম সম্বন্ধের

ব্যঞ্জনা বহন করছে। যে কবিতাটিতে কবি এই অবস্থার বিশ্লেষণ করেছেন তার নাম "সম্বন্ধ নির্দেশ"। বস্তুতঃ এই অনুপম কবিতাটি ভক্তপ্রবর ঈশ্বর গুপ্তের একটি দিগদর্শনকারী রচনা ও নিম্নোদ্ধৃত কবিতাংশটি বাংলা অধ্যাত্মমূলক সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ।* এমন গূঢ় রহস্যময় বিষয়ের এরূপ সহজ, সরল মধুর অভিব্যক্তি বিরল বললে অত্যুক্তি হয় না। কবিতাটির প্রারম্ভেই তিনি ঈশ্বরের কাছে তাঁর পূর্ব অভিযোগটি তুলে ধরে বলেছেন যে, মানুষ যে নাস্তিক হয় তার জন্য দায়ী স্বয়ং ঈশ্বরই। কারণ, ঈশ্বর সংসার-ক্লিষ্ট জীবের আকুল প্রার্থনায় কান দেন না। কবির ভাষায়—

"তুমিই নাস্তিক করে তুলেছ সবারে।"

তারপর বলেছেন, ঈশ্বরের সঙ্গে মানবের সম্বন্ধ কি না হতে পারে?—

"পিতা বলি মাতা বলি বন্ধু আর ভাই।
যখন যা বলে থাকি তুমি নাথ তাই॥"*

ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ স্থাপনের এত ব্যাপকতা থাকলেও কবি ঈশ্বরের সঙ্গে শুধু একটি সম্বন্ধই স্থাপন করতে চান, যা তিনি পূর্বেই ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়ে নিতে প্রয়াসী হয়েছেন। কবির এই সম্বন্ধটি নূতন, অভিনব, অত্যাশ্চর্যও বটে। তিনি নিজেকে ঈশ্বরের পিতা বলেছেন, আবার ঈশ্বরকে দিয়েই তাই স্বীকার করাতে দৃঢ়প্রচেষ্ট। যিনি সৃষ্টি করেন, যিনি নূতন জন্মদান করেন তিনিই পিতা। ঈশ্বর গুপ্ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাস্তিকদের কাছে বা ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসীদের কাছে প্রমাণ করেন বলে,' এক অর্থে তিনি ঈশ্বরের স্রষ্টা, ঈশ্বরের নূতন জন্মদাতা বা 'পিতা'।

এই হলো অধ্যাত্মজগতের একটি পরম বিস্ময়, একটি নূতন অভিনব সম্বন্ধ—ঈশ্বর পুত্র, মানব পিতা,—এই হলো গুপ্ত-কবির নূতন অভিনব মতবাদ। ভাবের অভিনবত্বে, কল্পনার বিরাটত্বে এবং উপলব্ধির ঐশ্বর্যে কবির এই কবিতাটি সত্যই অনুপম, সত্যই অতুলনীয়, সত্যই অত্যাশ্চর্য। নিম্নে কবিতাটির উদ্ধৃতিনিবন্ধ হল:—

"কান পেতে শুন শুন দোহাই দোহাই।
নূতন সম্পর্ক এক ঘটাইতে চাই॥
নাস্তিকেরা 'নাস্তি' বলে করিছে নিধন।
'অস্তি' বলে আমি করি তোমায় স্থাপন॥
তোমার 'অস্তিত্ববাদ' করেছি যখন।
পাকাপাকি একখানা করিব তখন॥
জন্ম দিয়া তুমি 'বাপ' হয়েছ আমার।
জন্ম দিয়া আমি তব কে হব তোমার॥
যদ্যপি আদর কর মনেতে বিচারি।
এ সুবাদে তোমার ত বাবা হতে পারি॥
বারবার 'বাবা' বলে ডেকেছি তোমায়।
একবার 'বাবা' বলে ডাকনা আমায়॥
ছেলের এ আবদারে আদর ত চাই।
বাপ বলে' ডাকিলে ত লজ্জা কিছু নাই॥
অধমে বলিতে বাপ লজ্জা যদি হয়।
যা বলিবে তাই বল বিলম্ব না সয়॥
ছেলে বল দাস বল বলা কিন্তু চাই।
না বলিলে কোনমতে ছাড়াছাড়ি নাই॥
ফুটে না বলিতে পার ভঙ্গী করে কও।
'ওরে বাবা আত্মারাম' হাবা কেন হও॥

যেরূপ জানাতে হয় সেরূপে জানাও।
যেরূপে মানাতে হয় সেরূপ মানাও॥"

সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন, সম্পূর্ণ শরণাগতি না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। সম্পূর্ণনির্ভরতা, সম্পূর্ণ নিরেট বিশ্বাস চাই, দৃঢ়নিষ্ঠা চাই, চাই অহৈতুকী ভক্তি, চাই অকারণ প্রেম। তবেই সাধকের ইষ্টদর্শন,—তাতেই সাধনার সিদ্ধি। এই ভাবটি কিরূপ অনিন্দ্যসুন্দরভাবে লীলায়িত হয়েছে, কি অপরূপ ভঙ্গিতে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। এই আশ্চর্য সুন্দর কবিতাটিতেই নিহিত রয়েছে কবি ঈশ্বর গুপ্তের জীবন-দর্শন তথা জীবন-বেদ। প্রত্যেক মহৎ কবিরই আছে জীবন-দর্শন বা জীবন-বেদ,—একটি প্রত্যয়সিদ্ধ জীবনবোধের মূলীভূত বিশেষ ধারণা। কবি ঈশ্বরচন্দ্র শুধু মহৎ কবিই নন, তাঁকে মহত্তম কবি বললেও অত্যুক্তি হবে না। কবিরও এই বিশেষ জীবন-বেদ তাঁর রচনার মধ্যে দিয়ে অন্তঃশীলা ফল্গুর মত প্রবহমান।

এই জীবন-দর্শনের মূলভিত্তি হল গভীরতম, স্থিরতম ঈশ্বর বিশ্বাস। এই ঈশ্বর কোন তত্ত্বের বস্তু নন, তর্কেরও বিষয় নন। এই ঈশ্বর সকল তত্ত্ব ও তর্কের বহুঊর্ধ্বে, বহু গভীরে তাঁর শাশ্বত পবিত্র আবির্ভাব; এ পরমাবির্ভাব সাধকের চিত্তমন্দিরে ধ্যানের দেবতারূপে শুধু নয়, প্রাণের প্রিয়, আত্মার দোসর, জীবনের দয়িতরূপে,—যাঁর সঙ্গে চলে সাধকের নিয়তই প্রেম-কলহ, মান-অভিমান, আদর-আবদারের লীলাখেলা। এই পরমপ্রিয়ের চরণে নিজেকে সম্পূর্ণ সঁপে দিয়ে, তাঁকে অসঙ্কোচে নিবেদন করে' নিজের সবকিছু, কবি সানন্দে বলেছেন—

"আমি যে হে 'আমি' বলি, সে 'আমিটি' কার।
আমির 'আমিত্ব' তুমি, সে নহে আমার॥

"যে পথে চালাও তুমি, সেই পথে চলি।
যেরূপে বলাও তুমি, সেইরূপ বলি॥
আমি বলি, আমি চলি, সাধ্য কিন্তু নাই।
চলাও বলাও তুমি, চলি বলি তাই॥"

কবি ঈশ্বরকে, যাঁকে তিনি প্রিয়তম পিতা বা পুত্র বলে জানেন, অভিমানবশতঃ 'কালা', 'কানা', 'বোবা' ইত্যাদি বললেও তাঁর দর্শনে কোন নৈরাশ্যবাদ নেই, তাঁর দর্শনে আছে প্রকৃত আশাবাদ। অর্থাৎ কবি ঈশ্বর গুপ্তের দর্শন হলো আশাবাদী-দর্শন। তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল যে, ভগবান ভক্তকে কখনোই দূরে ফেলে দেন না, বরং ভগবান প্রকৃত ভক্তকে সর্বদাই রক্ষা করেন, পালন করেন। তাই ভক্ত কবি বলেছেন—

"যে হও সে হও তুমি, যে হও সে হও।
ভক্তাধীন ভগবান ভক্ত ছাড়া নও॥"

সেজন্য কবি মুক্তির উপায় হিসাবে একমাত্র ভক্তিকেই প্রাধান্য দিয়ে বলেছেন—

"নানা শাস্ত্রে উক্তি আছে, যুক্তি কথা এই।
তোমারে যে ভক্তি করে, মুক্তি পায় সেই॥"

এ'যুগের ধর্মের প্রধান বাহন হল ভক্তি,—ধারাটিও ভক্তির। ভক্তিতেই ঈশ্বর তাঁর কৃপা দান করবেন। কবি অবশ্য ভক্তিতেই মুক্তির পথ নির্দেশ করলেও শেষ পর্যন্ত, ঈশ্বরের করুণা, কৃপা বা অনুগ্রহ পেলেই মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়। কেননা ভগবানের করুণা বা কৃপা না হলে ভক্তির উদ্বোধন হয় না মনে, মুক্তিরও দ্বার উদ্ঘাটিত হয় না। কবি এইকথাই অতি সুন্দর-ভাবে লিখেছেন—

"যে জীবেতে দয়াময়, তোমার না দয়া হয়।
সেই জীব জীব নয়, শিবত্ব না পায়॥

তুমি কৃপা কর যারে, ত্রিতাপে তরাও তারে।
সেই জীব একেবারে শিব হয়ে যায়॥"

কবির মতে এরকম বিশুদ্ধ ভক্তি লাভ করতে হলে চাই আত্ম-সংযম, পবিত্রতা, পরহিতায় আত্মবিসর্জন বা আত্মত্যাগ প্রভৃতি পুণ্যকর্ম বা মহৎ গুণ, তার পরিবর্তে শুধু শাস্ত্রপাঠ বা পূজা, মালা জপ বা হোম, যাগ প্রভৃতি বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান করলে এই 'শুদ্ধাভক্তির' সাক্ষাৎ মিলবে না :—

"যতদিন এই মন না হইবে বশ।
ততদিন পাইবে না তত্ত্বসুধা রস॥"

"দ্বেষ-হিংসা পরিহর বিবেকের সঙ্গ ধর,
সকলের প্রতি কর, সরল প্রণয়।
রসনারে কর বশ, বিভুগুণামৃত-রস,
পান করি লভ যশ, হয়ে কালজয়॥"

এরূপ সার্বজনীনপ্রীতি, সার্বজনীনতা, সার্বিক সমত্ববোধ প্রত্যেক মহৎ ও শ্রেষ্ঠ কবির বৈশিষ্ট্য। কবি ঈশ্বর গুপ্তের জীবনদর্শনের অপর একটি দিকই হলো এই বিশ্বাত্মবোধ, এই বিশ্বপ্রীতি ও বিশ্বমৈত্রী। যদি এই বিশ্বজনীনতা সব মানুষের মনে কাজ করে তাহলে মানুষে মানুষে থাকে না কোন পৈশাচিকতা বা বর্বর অত্যাচার, পররাজ্যলোভ বা প্রতি-হিংসার জ্বালা। যেহেতু সব মানুষই এক পরমপিতার সন্তান, তখন ভাইয়ে ভাইয়ে, মানুষে মানুষে ভেদ থাকে কেন। এই বোধটির কথা সুপ্রাচীন ও সুবিখ্যাত ঈশোপনিষদে অতি মনোরমভাবে ব্যক্ত হয়েছে :—

"যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষুচাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥"

অর্থাৎ যিনি সর্ববস্তুতে পরমাত্মা দর্শন করেন বা সব বস্তুকে

পরমাত্মাময় মনে করেন, তিনি কাউকে ঘৃণার চোখে দেখেন না বা ঘৃণা করেন না। এই মহৎপ্রতীতি ও বোধ কবি ঈশ্বরচন্দ্রের গভীর ও বিপুলভাবে ছিল। তাই দর্শনের এই মহত্তম বাণী-বাহক, সাম্য ও ঐক্যবাদী কবি ঈশ্বর গুপ্তও বহুবার বলেছেন—

"সকলেরে জ্ঞান কর আপনার সম।
তাহাতেই সিদ্ধ হবে দম আর শম।"

* * *

"জগতে সবাই, হয় ভাই ভাই,
আপনা দেখনা একা।
দেখাবে যেরূপ, দেখিবে সেরূপ,
মুকুরে বদন দেখা"॥
"ভাই আছ যত, হয়ে একমত,
এক ভাব সবে ধর।
করি একমন, করি এক পথ,
অমানে সুভোগ কর॥"

কবি ঈশ্বর গুপ্তের জীবন-দর্শনের এ'হলো সামান্য পরিচয় ও লেখাচিত্র। তিনি যে আজীবন সুপ্রাচীন ও মহান ভারতীয় সংস্কৃতিরই ধারক, বাহক ও প্রচারক ছিলেন, তা' গুপ্তকবির জীবন-দর্শনের এই ক্ষুদ্র সামান্য আলোচনা থেকেই স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। গুপ্তকবির জীবন-দর্শন শুধু কতকগুলি শুষ্ক কঠিন গূঢ়তত্ত্বেরই সমষ্টিই নয়, তত্ত্বের সংকীর্ণ সীমায়ও বন্দী নয়, সে দর্শন প্রসারিত ও ব্যাপ্ত হয়েছে মনুষ্যত্বের তথা বিশ্ব-মানবতার নিঃসীম দিগন্তে। বস্তুতঃ গুপ্তকবির জীবন-দর্শন তথা জীবন-বেদ মন্দ্রিত হয়েছে, ধ্বনিত হয়েছে মনুষ্যত্বের জয়গানে, বিশ্বমানবতার মূর্তি অঙ্কনে। মানবতার

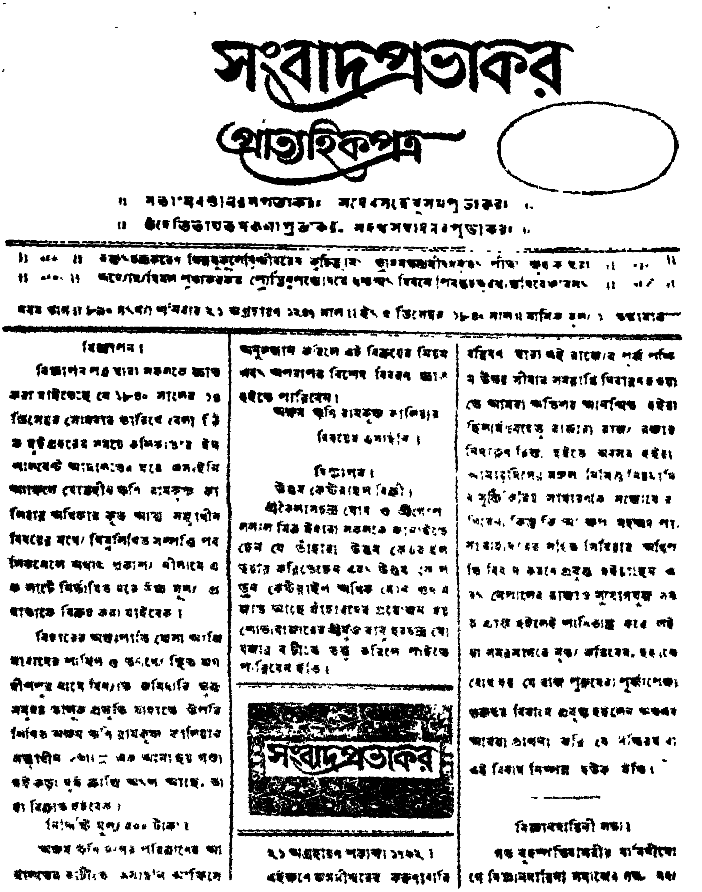
পূজারী কবি ঈশ্বরচন্দ্রের জীবন-দর্শন তাই মানবমহিমা প্রচার ও মানবতার পূজাকে আশ্রয় করেই তাঁর বিকাশ, তার সৌষ্ঠব, তার সৌরভ, তার মহত্ত্ব। শাস্ত্রে আছে :—

"দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ। শিবো ভূত্বা শিবং যজেৎ।" অর্থাৎ আগে নিজে দেব ও শিব হও, তারপরে দেব ও শিবের পূজা কর। আমাদের কবি ঈশ্বর গুপ্তও স্বয়ং পূর্ণ মানুষ হয়ে, ঈশ্বরময় সত্তা লাভ করে, অন্য সকলকেই পূর্ণ মানুষ-জ্ঞান করেছেন আর তাঁদেরই ঈশ্বর মনে করে তাঁদের প্রতি অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন :—

"কেবল পরের হিতে প্রেম লাভ যার।
মানুষ তারেই বলি, মানুষ কে আর॥
সকলে সমান মিত্র শত্রু নাই যার।
মানুষ তারেই বলি, মানুষ কে আর॥
অমৃত নিঃসৃত হয়, প্রতি বাক্যে যার।
মানুষ তারেই বলি, মানুষ কে আর॥
সতত গলার পরে করুণার হার।
মানুষ তারেই বলি, মানুষ কে আর॥"

কবি এখানে যেমন মনুষ্যত্বের জয়গানে মুখর হয়েছেন, তেমনি মানুষের প্রকৃত আদর্শ কি হওয়া উচিত তারও একটা সুস্পষ্ট সহজ সুন্দর নির্দেশ দান করেছেন। বস্তুতঃ একমাত্র সেযুগের সাধক কবি রামপ্রসাদের সঙ্গেই গুপ্তকবির তুলনা সার্থক। রামপ্রসাদ মাতৃভাবের উপাসক, ঈশ্বরচন্দ্র পিতৃ-ভাবের। মানবতার পূজারী, অধ্যাত্মপ্রেমী দার্শনিক কবি হিসেবে এ'যুগের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথই গুপ্তকবির একমাত্র সগোত্র। এক রবীন্দ্রনাথে ছাড়া এই বিচিত্র বোধ এমন বিপুল-ভাবে আর কারো মধ্যে বিভাসিত বা প্রকাশিত হয়নি।

'মানবতার কবি, ভূমামহানের কবি, পরিপূর্ণ প্রসারের কবি, বিপুল বিস্তারের এবং সর্বোপরি আনন্দামৃতরসসিঞ্চনকারী' কবি ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর সৃষ্টিতে তাই চিরভাস্বর, চিরসুন্দর; চির-অক্ষয় আসন রচনায় স্বর্ণস্বাক্ষর রেখে গেছেন।



'সংবাদ প্রভাকর' এর প্রথম পৃষ্ঠা

সাময়িক পত্র পরিচালনায় ঈশ্বর গুপ্ত

আজ যে আমরা ঘরে ঘরে বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র দেখতে পাই এবং চায়ের নেশার মত ভোরের আলো আকাশ ফুটে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্র পড়ার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে উঠে, এই দৈনিক সংবাদপত্র প্রথম প্রকাশ করেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ১৮৩১ সালে ২৮শে জানুয়ারী শুক্রবার "সংবাদ-প্রভাকর" নামে দৈনিক পত্রিকা তিনি প্রকাশ করেন। এই সংবাদপত্রখানি সেযুগে এক বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং সেই আলোড়নের ঢেউ আজও অব্যাহত।

'সংবাদ-প্রভাকর' সে-যুগের একখানি প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্র ছিল, দেশ-বিদেশের সংবাদ ছাড়া আরও পাঁচমিশেলি সংবাদ এতে থাকত। ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। তখনকার বহু স্বনামধন্য ব্যক্তি ও মনীষীরা এই পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। তাঁদের মধ্যে রাজা রাধাকান্ত দেব, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামকমল সেন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতির প্রাথমিক প্রবন্ধগুলি এই পত্রিকাতেই প্রকাশ হয়। ১২৫৪ সালের ২রা বৈশাখ তারিখের সংবাদ প্রভাকর থেকে লেখক ও সহযোগিদের সম্বন্ধে গুপ্তকবি যা লিখেছেন তার কিছু এখানে উল্লেখ করা হল :—

"প্রভাকরের লেখকের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে, প্রভাকরের পুরাতন লেখকদিগের মধ্যে যে যে মহোদয় জীবিত আছেন তাঁদের নাম

প্রকাশ করিলাম:—

(১) শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ। (২) শ্রীযুক্ত রাধানাথ শিরোমণি। (৩) শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ। (৪) বাবু নীরতন হালদার। (৫) শ্রীযুক্ত গদাধর তর্কবাগীশ। (৬) ব্রজমোহন সিংহ। (৭) গোপালকৃষ্ণ মিত্র। (৮) বিশ্বম্ভর পাইন। (৯) গোবিন্দচন্দ্র সেন। (১০) ধর্মদাস পালিত। (১১) বাবু কানাইলাল ঠাকুর। (১২) বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত। (১৩) বাবু নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। (১৪) বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত। (১৫) শ্রীশম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। (১৬) প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ। (১৭) রায় রামলোচন ঘোষ বাহাদুর। (১৮) হরিমোহন সেন। (১৯) জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক। (২০) সীতানাথ ঘোষ। (২১) গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। (২২) যাদবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। (২৩) হরনাথ মিত্র। (২৪) পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। (২৫) গোপালচন্দ্র দত্ত। (২৬) শ্যামাচরণ বসু। (২৭) উমানাথ চট্টোপাধ্যায়। (২৮) শ্রীশ্রীনাথ শীল। (২৯) শম্ভুনাথ পণ্ডিত।

সতীনাথ ঘোষ হইতে শম্ভুনাথ পণ্ডিত পর্যন্ত কয়েক জন তিন চারি বৎসর পর্যন্ত প্রভাকরের লেখক-বন্ধুর শ্রেণী মধ্যে ভুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য মহাশয় আমাদিগের সম্প্রদায়ের একজন প্রধান সংযুক্ত বন্ধু। শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদকের ন্যায় তাবৎ কর্ম সম্পন্ন করেন। অতএব ইঁহাদিগের বিষয় প্রকাশ করা অতিরেক মাত্র। বিশেষতঃ শেষোক্ত ব্যক্তির শ্রমের হস্তে যখন আমরা সমুদয় কর্ম সমর্পণ করি, তখন তাঁহার ক্ষমতা সকলেই বিবেচনা করিবেন।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অস্মাদ্দিগের সংযোজিত লেখক বন্ধু। ইঁহার সদ্‌গুণ ও ক্ষমতার কথা কি ব্যাখ্যা করিব! এই সময়ে আমাদিগের পরম স্নেহান্বিত মৃত বন্ধু বাবু প্রসন্নচন্দ্র ঘোষের শোক পুনঃ পুনঃ শেলস্বরূপ হইয়া হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে। যেহেতু ইনি রচনা বিষয়ে তাঁহার ন্যায় ক্ষমতা দর্শাইতেছেন, বরং কবিত্ব ব্যাপারে ইঁহার অধিক শক্তি দৃষ্ট হইতেছে। কবিতা, নর্তকীর ন্যায় অভিপ্রায়ের বাদ্যতালে ইঁহার মানসরূপ নাট্যশালায় নিয়ত নৃত্য করিতেছে। ইনি কি গদ্য, কি পদ্য—উভয় রচনা দ্বারা পাঠকবর্গের মনে আনন্দ বিতরণ করিয়া থাকেন।

ঠাকুরবংশীয় মহাশয়দিগের নামোল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র; যেহেতু

প্রভাকরের উন্নতি সৌভাগ্য প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি যে কিছু, তাহা কেবল ঐ ঠাকুরবংশের অনুগ্রহ দ্বারাই হইয়াছে। মৃত বাবু যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রথমতঃ ইহাকে স্থাপিত করেন। পরে বাবু কানাইলাল ঠাকুর ৺চন্দ্রকুমার ঠাকুর, ৺নন্দলাল ঠাকুর, বাবু হরকুমার ঠাকুর, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মৃত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, বাবু রমানাথ ঠাকুর, বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মহাশয়েরা আমাদিগের আশার অতীত কৃপা বিতরণ করিয়াছেন, এবং ইঁহাদিগের যত্নে অদ্যাপি অনেক মহাশয় আমাদিগের প্রতি যথোচিত স্নেহ করিয়া থাকেন।

প্রভাকরের প্রতি বাবু গিরীশচন্দ্র দেব মহাশয়ের অত্যন্ত অনুগ্রহ জন্য আমরা অত্যন্ত বাধ্য আছি। বিবিধ বিদ্যাতৎপর মহানুভব বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভাকরের প্রতি অতিশয় স্নেহকরতঃ ইহার সৌভাগ্যবর্ধন বিষয়ে বিপুল চেষ্টা করিয়া থাকেন। বাবু রামপ্রসাদ রায়, বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ, বাবু মাধবচন্দ্র সেন, বাবু রাজেন্দ্র দত্ত, বাবু হরচন্দ্র লাহিড়ী, বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরী, রায় হরিনারায়ণ ঘোষ প্রভৃতি মহাশয়েরা আমাদিগের পত্রে সমাদর করিয়া, উন্নতিকল্পে বিলক্ষণ যত্নশীল আছেন।*

সংবাদ-প্রভাকর শুধুমাত্র সাহিত্য পত্রিকা ছিল না, এই পত্রিকায় নানাবিধ সংবাদ পরিবেশন হত এবং সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ঈশ্বর গুপ্ত দেশবাসীকে তাঁদের কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন। কারণ তখন আমাদের সামাজিক অবস্থা এত অবনতির দিকে চলেছিল যে বাঙালী তথা হিন্দুদের রীতি-নীতি ত্যাগ করে অধিকাংশ মানুষ ইংরেজের অনুকরণ করে চলেছিল। বাংলাভাষা, বাংলার নিজস্ব সম্পদ বিনষ্ট করে বিদেশের জিনিসকে গ্রহণ করবার জন্য একদল উচ্ছৃঙ্খল জনতা প্রমত্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত তখন এই সংবাদ-প্রভাকরের মাধ্যমে ক্রমাগত দেশবাসীর মনে দেশাত্মবোধ জাগাবার জন্য কখনও ব্যঙ্গ কখনও বিদ্রূপের নিদারুণ

* বাংলা সাময়িক পত্র, পৃষ্ঠা ৩৬-৩৭।

কশাঘাতে তাদের আহত করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর গুপ্তের প্রচেষ্টায় তখনকার সমাজ অনেকাংশে অধোগতি থেকে রক্ষা পেয়েছে। নতুবা আমরা বঙ্গসমাজকে আরো বিশৃঙ্খলার মধ্যে, আরো অধঃপতনের মধ্যে দেখতে পেতাম। সেজন্য ঈশ্বর গুপ্তের জীবন ও কার্যকলাপ নিয়ে গবেষণা করে দেখার দিন এসেছে। সংবাদ প্রভাকর পাঠ করলে দেখতে পাব ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে সমগ্র জাতির মর্মস্থলে সঞ্চারিত করলেন পরাধীনতার তীব্র বেদনা; দেশবাসীকে বুঝিয়ে দিলেন যে, স্বাধীনতা মানুষ মাত্রেরই কাম্য এবং পরাধীনতাই জাতির দুঃখ দুর্দশার একমাত্র কারণ। তাই তিনি লিখলেন :

"যৎকালীন এক জাতির একরূপ স্বভাবান্বিত ব্যক্তি এক ধর্মাবলম্বী মনুষ্যেরা ভিন্ন দেশীয় ভিন্ন ধর্মী ব্যক্তিব্যূহের শাসনের অধীন হয়েন, তৎকালীন ভিন্ন ব্যবস্থার অনুরাগী হইয়া কোনমতেই সুখী হতে পারেন না, কারণ তখন তাহারদিগের মনে স্বাধীনতার আলোক সম্পূর্ণরূপে প্রদীপ্ত থাকে, কিন্তু পরে তত্তৎ ব্যক্তিদিগের পুত্র পৌত্রেরা আর তদ্রূপ দুঃখে দুঃখী হয়েন না, কারণ তাঁহারা স্বাধীনতার সুখ জ্ঞাত নহেন। পরাধীন রাজ্যে জন্মগ্রহণ করত শুদ্ধ প্রভুভক্তিপরায়ণ হয়েন। অধুনা আমাদিগের অবস্থা সেইরূপ হইয়াছে। পূর্বপুরুষদিগের শাস্ত্রীয় সংস্কার যদ্দ্বারা এই ভারত রাজ্য অগ্রগণ্যরূপে প্রতিপন্ন হয়েছিল, আমরা তাহাতে সম্পূর্ণরূপে পূর্বে বঞ্চিত হইয়াছি, কি আক্ষেপ? অনবরতই যে জাতির বিদ্যার্থি বালকবর্গের বচন সুধাকরের সুধায় সঞ্চয় হইত এবং পরমেশ্বর আরাধনাকল্পে কৃতজ্ঞতা-রথে কুমিষ্ট রচনাদি বিনির্গত হইয়া জনকজননীর আহ্লাদ বিতরণ করিত, এইক্ষণে সেই-জাতীয় বালকেরা অর্থকরী বিদ্যার ক্রীতদাস হইয়া সর্বদাই কেবল বিজাতীয় ভাষা উচ্চারণ করিতেছে এবং ঐ ভিন্ন দেশীয় অর্থকরী বিদ্যাকে পরমার্থকারী জ্ঞান করিতেছে জাতির ভাষার আলোচনা প্রায় লোপ হইয়াছে, এইক্ষণকার প্রাচীন লোকেরাও তাহার মর্যাদা দান করেন না...

সকলেই মনে মনে বিলক্ষণ জানিতেছেন আমাদের স্বাধীনতা লোপ হওনের সংগে সংগে শাস্ত্র-ভাষা আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি এবং ধর্ম-কর্ম প্রভৃতি সকল বিষয়ে লোপ হইতেছে, পূর্বে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সন্তানেরা অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন, সম্প্রতি তাঁহারাও অন্ন-চিন্তায় কাতর হইয়া অর্থের নিমিত্ত বিজাতীয় বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইয়াছে, অধ্যাপক মহাশয়েরা অশেষ প্রকার ক্লেশ সম্ভোগান্তর বিবিধ বিদ্যায় সুপণ্ডিত হইলেও দেশস্থ জনগণ সমীপে সমুচিত সমাদর প্রাপ্ত হয়েন না। সুতরাং ইহাতেই তাঁহারা উৎসাহশূন্য হইয়া মনের আক্ষেপে শাস্ত্রালোচনায় বিরত হইতেছেন, এবং লোক সকল রকমে আচারভ্রষ্ট ও ধর্মভ্রষ্ট হওয়াতে ক্রিয়াকর্মে ব্যাঘাতবশত তাঁহাদিগের উপজীবিকার বিড়ম্বনা হইতেছে, হে বন্ধুবর্গ আপনারা প্রণিধান করিলে কেবল ইহাই জানিতে পারিবেন যে, শুধু পরাধীনতাই আমাদের হিন্দু জাতির ঐবম্ভূত দুর্গতি হইয়াছে।"*

১৮৪৮ সালে ঈশ্বর গুপ্ত দেশবাসীকে স্বাধীন হবার জন্য "সংবাদ প্রভাকর" মারফৎ যে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন, তা' যে ব্যর্থ হয়নি—ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। স্বাধীনতার স্পৃহা যে ভারতবাসীর অন্তরে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় ধিক ধিক করে জ্বলছিল, অনুকূল বায়ুর সহযোগিতায় তা যে ভীষণ দুর্দৈব ঘটাতে পারে তা' ইংরাজও বুঝেছিল। ১৮৫৬ সালে ভারতের বড়লাটের সম্মানার্থে বিলাতে প্রদত্ত ভোজসভায় লর্ড ক্যানিং বলেছিলেন :—

"I wish for a peaceful form of office. But I cannot forget that in the sky of India, serene as it is, a small cloud may arise no longer, may at last threaten to burst and overwhelm in ruin."

ক্যানিং-এর এই কালো মেঘই ১৮৫৭ সালে ভারতবর্ষে

*সংবাদ প্রভাকর ১লা বৈশাখ ১২৫৫ সাল।

"সিপাহী বিদ্রোহ" রূপে আত্মপ্রকাশ করে। "সংবাদ প্রভাকর" পাঠ করলে এটুকু বুঝতে পারা যায় যে, ঈশ্বর গুপ্ত জাতীয়তাবাদী ছিলেন। ভারতবর্ষকে শোষণ করাই যে ব্রিটিশের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তা' তিনি লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করতে দ্বিধা করেননি। পক্ষান্তরে তিনি লিখেছেন :—

> "ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা এই দেশের অধীশ্বর হইয়া শুদ্ধ স্বদেশের উপকারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছেন, সুতরাং তাহাদিগের কৃত নিয়মাদিও পরিপূর্ণ পক্ষপাত প্রকাশ হইয়াছে, তাঁহারা এদেশের অর্থশোষক হইয়াছেন এবং সেই অর্থে স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগের দীর্ঘোদর পরিপূর্ণ করিতেছেন, সুতরাং সাহেবগণের প্রভুত্ব বৃদ্ধি হইয়া উঠিয়াছে, কেবল এতদ্দেশীয় মানুষেরা নিঃস্ব হইয়াছেন।*

একথা সহজেই অনুমেয় যে সংবাদ প্রভাকরের মাধ্যমে ঈশ্বর গুপ্ত সাংবাদিক জীবনের মধ্য দিয়ে কীরূপ মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে গেছেন যা জাতির ও দেশের পক্ষে হিতকর। তখনকার দিনে এ'ধরনের কাজ করা বা পত্রিকায় লেখা দুরূহ ব্যাপার ছিল কারণ এইসব স্বাধীনতা-পিপাসু ব্যক্তিদের তখনকার ইংরেজ সরকার সদলে বিনষ্ট করার চেষ্টায় ছিলেন কিন্তু গুপ্ত কবির স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদী মনকে বহু চেষ্টা করেও ইংরেজ কর্তৃপক্ষ দমন করতে পারেনি। ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন নির্ভীক সাংবাদিক। কাউকে পক্ষপাতিত্ব করে তিনি সংবাদ ছাপতেন না, যা সত্য ও বাস্তব তাই তাঁর লেখনীর দ্বারা অকুতোভয়ে ব্যক্ত হত—এই হচ্ছে তাঁর সাংবাদিক জীবনের বৈশিষ্ট্য। "সংবাদ প্রভাকর" ছাড়া ঈশ্বর গুপ্ত আরও কয়েকখানা পত্রিকা প্রকাশ করেছেন তার মধ্যে 'সংবাদ-রত্নাবলী', 'পাষণ্ড পীড়ন', 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' প্রভৃতি। এই

* সংবাদ প্রভাকর ২০শে জ্যৈষ্ঠ ১২৫৫ সাল।

সমস্ত পত্রিকা প্রকাশে সেকালের বড় বড় জমিদারেরা ঈশ্বর গুপ্তকে সাহায্য করেছিলেন; যেমন 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশে পাথুরেঘাটার যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁকে সাহায্য করতেন। আবার 'সংবাদ-রত্নাবলী' প্রকাশে আন্দুলের জমিদার জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক ঈশ্বর গুপ্তকে সাহায্য করতেন। এ-সম্পর্কে ঈশ্বর গুপ্ত নিজেই লিখেছেন :—

"বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের আনুকূল্যে মেছুয়াবাজারের অন্তঃপাতী বাঁশতলার গলিতে 'সংবাদ-রত্নাবলী' আবির্ভূত হইল। মহেশচন্দ্র পাল এই পত্রের নামধারী সম্পাদক ছিলেন। তাঁর কিছুমাত্র রচনাশক্তি ছিল না। প্রথমে ইহার লিপিকার্য আমরা নিষ্পন্ন করিতাম। রত্নাবলী সাধারণ সমীপে সাতিশয় সমাদৃত হইয়াছিল। আমরা তৎকর্মে বিরত হইলে রঙ্গপুর ভূম্যাধিকারী সভার পূর্বতন সম্পাদক রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য এই পদে নিযুক্ত হয়েন।"*

তারপর ঈশ্বর গুপ্ত ১৮৪৬ সালে ২০শে জুন প্রভাকর ছাপাখানা হতে "পাষণ্ডপীড়ন" নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :—

"১২৫৩ সালে আষাঢ় মাসের সপ্তম দিবসে প্রভাকর যন্ত্রে পাষণ্ডপীড়নের জন্ম হইল। ইহাতে পূর্বে সর্বজন মনোরঞ্জন প্রকৃষ্ট প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রকটিত হইত। পরে ৫৪ সালে কোন বিশেষ হেতুতে পাষণ্ডপীড়ন, পাষণ্ড পীড়ন করিয়া আপনিই পাষণ্ড হস্তে পীড়িত হইলেন। অর্থাৎ সীতানাথ ঘোষ নামক জনৈক কৃতঘ্ন ব্যক্তি যাহার নাম এই পত্রে প্রচারিত হয়, সেই অধার্মিক ঘোষ বিপক্ষের সহিত যোগদান করত ঐ সালের ভাদ্র মাসে পাষণ্ডপীড়নের হেড চুরি করিয়া পলায়ন করিল, সুতরাং আমাদিগের বন্ধুগণ তৎপ্রকাশে বঞ্চিত হইলেন। ঐ ঘোষ উক্ত পত্র ভাস্করের করে দিয়া পাতরে আছড়াইয়া নষ্ট করিল।"†

* সংবাদ প্রভাকর ১লা বৈশাখ, ১২৫৯ সাল।

† সংবাদ প্রভাকর ১লা বৈশাখ, ১২৫৯ সাল।

পাষণ্ডপীড়ন বন্ধ হয়ে যাবার পর ১২৫৪ সালে ভাদ্র মাসে ঈশ্বর গুপ্ত "সংবাদ সাধুরঞ্জন" নামে আর একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় তিনি ছাত্রদের রচনা বেশী করে প্রকাশ করতেন এবং তাদের উৎসাহ দিতেন। ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর জীবনে দেশের কাজে নানাভাবে নানাদিকে নিজেকে পরিচালনা করেছিলেন। সাময়িকপত্র পরিচালনা তাঁর বৈচিত্র্যময় তিভাদাপ্ত কর্মব্যস্ত জীবনের একটা বিশেষ দিক মাত্র। এ-সকল পত্রিকায় তিনি সংবাদ পরিবেশন ছাড়া আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন যার জন্য আমরা গুপ্তকবির নিকট চিরঋণী। প্রাচীন কবিদের অপ্রকাশিত রচনা ও জীবনী সংগ্রহ করে তিনি সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশ করেন। এ কাজে তিনি এগিয়ে না এলে প্রাচীন কবিদের আজ কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যেত না। সংবাদ প্রভাকরে যে-সব কবিদের জীবনী প্রকাশ হয় তার একটি তা   এখানে দিলাম :—

১। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন	১ আশ্বিন, ১ পৌষ, ১ মাঘ ১২৬০
২। রামনিধি গুপ্ত (নিধিবাবু)	১ শ্রাবণ, ১ ভাদ্র ১২৬১
৩। রাম (মোহন) বসু	১ আশ্বিন, ১ কার্তিক, ১ অগ্রহায়ণ ১২৬১
৪। নিত্যানন্দদাস বৈরাগী	১ অগ্রহায়ণ ১২৬১
৫। কেষ্টা মুচী	১ অগ্রহায়ণ ১২৬১
৬। লালু নন্দলাল	১ অগ্রহায়ণ ১২৬১
৭। গোঁজলা গুঁই	১ অগ্রহায়ণ ১২৬১
৮। হরু ঠাকুর	১ পৌষ ১২৬১
৯। রাসু, নৃসিংহ, লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস (লোকে কানা)	১ মাঘ ১২৬১

এতগুলি লোকের জীবনী সংগ্রহ করে এবং তা সংবাদ

প্রভাকরে প্রকাশ করে ঈশ্বর গুপ্ত যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা সে যুগে আর কোন পত্রিকার সম্পাদকের পক্ষে সম্ভব হয়নি। গুপ্তকবির মৃত্যুর* পর তাঁর অনুজ রামচন্দ্র গুপ্ত সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদক হন। তিনি ঈশ্বর গুপ্তের আশীর্বাদ নিয়ে পত্রিকাটি কিছুদিন পর্যন্ত পরিচালনা করেছিলেন।

ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর 'সংবাদ প্রভাকর'এ কি কি ধরনের রচনা লিখতেন সংক্ষেপে তাঁর রচনার বিষয়-বৈচিত্র্যের কিছু কিছু উল্লেখ করছি। রচনার বিষয় বা নামকরণ-এর মধ্য দিয়ে একথা সহজেই বোঝা যাবে যে, গুপ্তকবি তাঁর সাংবাদিক-জীবনে সংবাদ প্রভাকরের মাধ্যমে সম্পাদকীয় রচনা ছাড়াও যে কত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোচনা করতেন এবং সেসব বিষয় সম্পর্কে তৎকালীন পাঠকবর্গকে অবহিত করতেন। সমাজের বিশেষ করে তথাকথিত শিক্ষিত শ্রেণীর মানুষের মনে যাতে তাঁর ঐ সব রচনা প্রভাববিস্তার করতে পারে, সেদিকে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। "To work with purpose"—অনেকটা জয়যুক্ত হয়েছে সাংবাদিক ঈশ্বর গুপ্তের কলমে। নিচে তাঁর রচনার বিষয়বৈচিত্র্যের কিছু উল্লেখ করা হল—

> "অর্থনীতি বিষয়ে রচনাগুলির মধ্যে 'শিল্পবিদ্যার অনুশীলন', স্বদেশীয়দের বাণিজ্যকর্ম, জমিদারি ও সূর্যাস্ত আইন, জমিদার ও কৃষক, রাজকর্মে নিয়োগপ্রসঙ্গ, স্বর্ণমুদ্রা, নীলকর, বাণিজ্য-ট্যাক্স, মহাজনের অত্যাচার, ম্যাঞ্চেস্টারের বস্ত্রশিল্প প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সমাজ বিষয়ে রচনাগুলির মধ্যে "বিজ্ঞানদায়িনী সভা, বাল্যবিবাহ, রাধাকান্ত-দেবের মামলা, ধর্মসভার দলাদলি, দেশী-বিদেশীর মর্যাদাভেদ, বিধবার

* ২৩শে জানুয়ারী ১৮৫৯ সাল।

বিবাহ, কলিকাতার পুলিশের নিয়ম, মর্নিং ক্রনিকেলের সমালোচনা, ভারতবর্ষের অবস্থা, ইংরেজ ও বঙ্গদেশ, নেটিভ খৃষ্টানদের সম্পত্তি, শিক্ষা ও চাকুরী, রুশদের সম্বন্ধে গুজব, স্বাধীনতা ও দাসত্ব, স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবাবিবাহ, প্রভাকরের লেখকগোষ্ঠী, বঙ্কিমচন্দ্রের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদলাভ, মহারাণীর রাজ্যোৎসব, সিপাহী বিদ্রোহ, হিন্দুমেলা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিক্ষা বিষয়ক রচনাগুলির মধ্যে "হুগলী কলেজের বিবরণ, বঙ্গভাষার অনুশীলন, শিক্ষা ও খ্রীস্টানমিশনারী, হিন্দু কলেজে বাংলা শিক্ষা, বাংলা পাঠাগার, বাংলাভাষার ইতিবৃত্ত রচনা, সংস্কৃত কলেজ, ইন্ডিয়ান ফ্রি স্কুল, হিন্দু কলেজ ও এডুকেশান কৌন্সিল, বিদ্যাসাগর, বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলা-ভাষা, শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনা, সুনীতিশিক্ষার প্রয়োজন প্রভৃতি উল্লেখ্য। এছাড়া বিবিধ বিষয়ের মধ্যে "ইয়ং বেঙ্গল সম্বন্ধে পদ্য, ডেভিড হেয়ার স্মৃতিসভা, প্রভাকর সম্পাদকের মতামত প্রসঙ্গে, কুমার-হট্টের বালিকা বিদ্যালয়, কৃষ্ণনগর কলেজ ও রামতনু লাহিড়ী, বেথুনের স্মৃতিসভা, রাণী রাসমণির সৎকার্যে দান, বাংলার জমিজরীপ, কলিকাতার পাবলিক লাইব্রেরী, প্রাচীন কবিজীবনী ও কবিগান সংগ্রহের জন্য আবেদন প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।"*

* সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (১ম খণ্ড)—বিনয় ঘোষ সম্পাদিত।

ঈশ্বর গুপ্ত ও সিপাহী বিদ্রোহ

কবি ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু একশো বছরের অধিক হয়ে গেল। একশো বছরেরও অধিক হয়ে গেল সিপাহী বিদ্রোহের। বাঙালীর জাতীয় ইতিহাসে এই দুই স্মরণীয় ঘটনা একই সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়েছে। ঈশ্বর গুপ্তের প্রতিভা উদ্ভাসিত হয়েছিল বহুদিকে—সাহিত্যিক, সাংবাদিক, লোকশিক্ষক, বিদ্যোৎসাহী, দেশপ্রেমিক, স্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহদাতা, সর্বোপরি ঈশ্বরানুরাগী ঈশ্বরচন্দ্র এক সঙ্গে দেশ ও জাতির অনুরাগ ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন। একই মানুষের মধ্যে এমন বিচিত্র বহুমুখী গুণ সম্পদের অপূর্ব সমাবেশ সত্যই প্রশংসার যোগ্য। সিপাই বিদ্রোহের সঙ্গেও ঈশ্বর গুপ্তের সংযোগ ছিল পরোক্ষ ভাবে। ঈশ্বরচন্দ্র সংবাদ জগতের মাধ্যমে বিভিন্ন আন্দোলনের অনুপ্রেরণা যুগিয়ে এসেছেন। নীলকর অত্যাচার, ডালহৌসীর বিভেদনীতি, সাঁওতাল বিদ্রোহ, সর্বোপরি প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম ও প্রত্যেকটি স্বাধীনতা সংগ্রামের সংবাদ সরবরাহ করে তিনি সমসাময়িক ও ভবিষ্যৎ দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়ে আছেন, আজকের দিনে এই সকল ক্ষেত্রে তাঁর কথা শ্রদ্ধা সহকারে স্মরণ করা প্রয়োজন। এ শুধু আলোচনার স্বার্থে আলোচনা নয়, যুগপ্রয়োজনেই এই আলোচনা।

ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সংবাদ সরবরাহ করেই ক্ষান্ত ছিলেন না ঈশ্বরচন্দ্র, পরন্তু দেশের স্বাধীনতার জন্য দেশবাসীর মনে ছড়িয়ে দিলেন পরাধীনতার বেদনা ও স্বাধীনতার মর্মকথা। আজ এই ঐতিহাসিক সিপাহী বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে

স্বাধীনতা সংগ্রামের যে ইতিহাস রচনা করবেন ভাবি কালের ঐতিহাসিকগণ, তাতে ঈশ্বর গুপ্তের নাম লিখিত হওয়া উচিত। তাঁর প্রকাশিত সমগ্র রচনা পাঠ করলে শুধু এটুকুই বোঝা যায় তিনি ছিলেন জাতীয়তাবাদী এবং স্বদেশপ্রেমিক। একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে শতাধিক বছর পূর্বে ঈশ্বর গুপ্ত ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে যে সব বিরুদ্ধ মন্তব্য করেছিলেন তা সত্যই বিস্ময়কর। আজ হয়ত উৎসাহী ও অনুসন্ধিৎসু গবেষক ইতিহাস খুঁজলে আরও বহু অজ্ঞাত মূল্যবান তথ্যের সন্ধান লাভ করবেন। গুপ্তকবির জীবনেতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, এই মানুষটি নিতান্ত সঙ্গীহীন অবস্থায় ভীষণ বিপদের ঝুঁকি নিয়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সম্বল ছিল এক হাতে কলম, আর এক হাতে চাবুক। এই চলার পথে পাননি কোন সাথী, নিঃসঙ্গ বিহঙ্গের মতো তাঁর পদচারণা। কেউই তাঁকে দেয়নি কোন উৎসাহ ও আশ্বাস, পক্ষান্তরে তিনি পেয়েছেন দুঃখ ও নিপীড়ন। সারা জীবন একাগ্র সাধনার দ্বারা তিনি নিপীড়িত মানুষের মুক্তি খুঁজেছেন ও এই অবিচার নিষ্পেষণের প্রতিকারকল্পে মসীচালনা করেছেন 'সংবাদ প্রভাকরে'র পাতায় পাতায়। মানুষের মুক্তিসাধনাই ছিল তাঁর কাম্য। যে সম্মানের আসন তাঁর প্রাপ্য ছিল, তা দেশবাসী তাঁকে দেয় নি। কোন ব্যক্তিকে জানতে হলে তাঁকে জানার শ্রেষ্ঠ উপায় হল তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়া। তাঁর চিন্তাধারাকে উপলব্ধি করতে পারলে তবেই তাঁকে জানা সম্পূর্ণ হবে। কবি ঈশ্বর গুপ্তকে জানতে হলে শুধু তাঁর কয়েকটি তথাকথিত অশ্লীল কবিতা জানলে বা পড়লে চলবে না; তাঁকে জানতে হলে সর্বাগ্রে চাই তাঁর ব্যথিত

জীবনের দিনগুলির সঙ্গে পরিচয় লাভ। ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ ও স্বজন-পরিজনের বিদ্রূপ তাঁকে পীড়া দিলেও অপর দিকে তাঁকে সঞ্জীবিত করেছে। মনের মধ্যে এনে দিয়েছে এক আলোড়ন। সে দুঃখ ও দারিদ্র্য তাঁকে করেছে মহান। বঙ্কিমচন্দ্রের অনবদ্য ভাষায় :—

> "ঈশ্বর গুপ্ত সমাজকে নিজ বাহুবলে পরাস্ত করিয়া তাহার নিকট হইতে ধন, যশ, সম্মান আদায় করিয়া লইলেন।"

ঈশ্বর গুপ্তকে জীবনে নানা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়েছে, কিন্তু তাতে তিনি দমিত হননি কখনো। বাংলার সামাজিক আকাশে তখন ঘোর তমিস্রা। এক দিকে দেশের নব্য ইংরেজনবীশ দল যাঁরা এতদিন জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করে এসেছে, অনেকটা তাদের শায়েস্তা করার জন্যই ঈশ্বর গুপ্তকে অশ্লীল ও ব্যঙ্গ কবিতার আশ্রয় নিতে হয়েছিল। আর অপরদিকে সাম্রাজ্যলোভী ইংরেজকে আঘাত দেওয়ার জন্য লেখনীর দুঃসাহসিক অভিযান চালাতে হয়েছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে ঈশ্বরচন্দ্রকে যুগপৎ দুই ভয়ঙ্কর শত্রুর সঙ্গে (স্বদেশের ও বিদেশের) লড়াই করতে হয়েছে। আজ বিংশ শতাব্দীতেও দেশের যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে, তাতেও মাঝে মাঝে আমরা বিশৃঙ্খলাকারীদের ব্যঙ্গ কবিতায় বা ছড়ায় তীব্র কশাঘাতের চেষ্টা করি। কবিরও সেযুগে এই ছিল একমাত্র পথ। একে সামাজিক ইতিহাসের একটা ধারা বলা যেতে পারে। এই শতাব্দীতেও অন্যতম জাতীয় কবি দ্বিজেন্দ্রলালকেও বিজাতীয় মোহাচ্ছন্নদেশবাসীর চৈতন্যোদয়ের জন্য ব্যঙ্গ কবিতা ও রচনার সাহায্যে এইভাবে তীব্র কশাঘাত করতে হয়েছে। এই ধরনের উক্তি বা রচনার দ্বারা সৃষ্ট আঘাতে সমাজ-বিরোধী লোকের মনে যে চেতনা উদয়ের জন্য যুগে যুগে এক

একজন মহা মনীষীর আবির্ভাব হয়, যাঁদের চেষ্টায় সাধারণ মানুষের নৈতিক পরিবর্তন ঘটে; কবি ঈশ্বর গুপ্ত তাঁদেরই অন্যতম। কাজেই বিগত কালের সঙ্গে বর্তমানের অনেক সাদৃশ্য দেখা যাচ্ছে। এই যুগপরিস্থিতিতে ও যুগের প্রয়োজনে অপর এক ঈশ্বর গুপ্তের পুনরাবির্ভাব বিশেষ প্রয়োজন বলে মনে করি। সিপাহী বিদ্রোহের পর তিনি যুদ্ধবিষয়ক ঘটনাগুলিকে ছন্দে গ্রথিত করে আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন, যেমন শিখ যুদ্ধকে বর্ণনা করে তিনি বলেছেন :

"লিখিতে উদার দুঃখ, লেখনীর মুখে।
সেলের মরণগুলি, শেল ফুটে বুকে॥
এতি কম্প ছেড়ে কেম্প, অস্ত্রধরি বলে।
মরিলে শীকের যুদ্ধে, সময়ের স্থলে॥
হায় হায় এই দুঃখ কিসে হবে দূর।
বৃটিশের রক্ত খায়, শৃগাল কুক্কুর॥"

সিপাহী বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে যে সব ছোট বড় বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল, সেগুলি কখনো বৃটিশের জয়, কখনো বা দেশীয় সৈন্যদের জয়, এরকম ভাবে বহুবার জয়-পরাজয়ের পালা ঘটেছে উভয় পক্ষের। কবি এই সুযোগে বৃটিশের পরাজয়ের কলঙ্কের উপর আরো বেশী কালি লেপনের জন্য নির্ভয়ে কলম চালিয়েছেন। ইংরেজ রাজত্বে বাস করে ইংরেজের পরাজয়ের কথা এমন কি "বৃটিশের রক্ত খায় শৃগাল কুক্কুর"— এমন দুঃসাহসিক কথা বলা বা লেখায় যে কতটা নির্ভীকতা কতটা তেজস্বিতা ও মনোবলের প্রয়োজন তাই লক্ষণীয়। এমন নির্ভীকতা শুধু সে যুগে তো নয়ই, এমন কি এ-যুগেও তার দৃষ্টান্ত বিরল দৃষ্ট। যুদ্ধ সম্বন্ধে কবির যে সকল কবিতা আছে, তা সত্য ঘটনার অনুরূপ বলেই মনে হয়, কারণ

যখন বৃটিশের জয় হয়েছে তখন তাঁদের জয়ের কথা লিখেছেন। এ থেকেই বোঝা যায় যে, সত্য ঘটনাগুলিকে তিনি প্রকৃত সাংবাদিক দৃষ্টিতে দেশের সামনে পরিবেশন করেছেন 'সংবাদ প্রভাকরে'র মাধ্যমে। বহু যুদ্ধের কথা তিনি লিখেছেন সমসাময়িক ঘটনাগুলিকে কেন্দ্র করে—যার ফলে সে যুগের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের অনেক মূল্যবান উপাদানের সৃষ্ট হয়েছে তাঁর রচনায়, সেগুলির মধ্যে শিখ যুদ্ধ, কানপুরের যুদ্ধ, দিল্লীর যুদ্ধ, এলাহাবাদের যুদ্ধ, কাবুলের যুদ্ধ, আগ্রার যুদ্ধ, ব্রহ্মদেশের সংগ্রাম ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সমন্বয়ের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

বাংলা সাহিত্যের পুনর্বিচার শুরু হয়েছে, কারণ বিশ্ব জুড়ে চলেছে সাহিত্য-সঙ্কট। সেই সঙ্কট বাংলা সাহিত্যের উপরও প্রভূত পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর কাব্যকে তৎকালীন সমালোচকেরা যে দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করেছেন, বর্তমান যুগের সমালোচকেরা তাকে অবশ্যই অন্যরূপে দেখবেন। আমাদের পূর্ববর্তীরা কি সম্পদ আমাদের সাহিত্যে রেখে গেছেন, সেই প্রশ্নই আজ জাতির সামনে এসে পড়েছে। সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে ধর্ম, সমাজ সংস্কার, রাজনৈতিক স্বাধীনতার আন্দোলন বাঙালীর জাতীয় অন্তরকে বিহ্বল আবেগে মন্থন করেছিল। এই মন্থনকার্যে মূলতঃ সহায়তা করেছে জাতির সাহিত্য চেতনা। আজকের সাহিত্য বলতে যা বোঝায়, আমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তা বোঝে নি। অর্থাৎ জীবনের জটিল চক্র আশা, আকাঙ্ক্ষা সব কিছুকেই, সব ভাবকেই সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করতে দেয় নি। এমন একটি বিচারপদ্ধতির আশ্রয় তাঁরা নিয়েছিলেন যার ফলে বস্তুর একটি মাহাত্ম্য আপনা হতে প্রকাশ হয়ে পড়ত। এই বস্তু সামাজিক ও এর গুণগত বিকাশ আধ্যাত্মিক। আমাদের যে কোন চিন্তা, যে কোন সমাজ-কর্ম এই দুটি মৌলিক বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। আমরা কোন কোন সময় একে সাহিত্যের মধ্যে, সৌন্দর্য সাধনার মধ্যে সজ্ঞানে গ্রহণ করে থাকি। কোন কোন সময় আমাদের অবচেতন মনে এরা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এই

প্রভাব যে সাহিত্যের রচনা দ্বারা সুসজ্জিত, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। রামমোহন হতে বঙ্কিম—এই সুদীর্ঘ মানস চিন্তার রাজ্য শুধুমাত্র সামাজিক বস্তুর দ্বারা গঠিত হয় নি। বরং রামমোহন নিছক সামাজিক চেতনা জাগ্রত করার আগে অধ্যাত্ম চিন্তার সূত্র খুঁজে বের করেন। এই অধ্যাত্ম চিন্তা এমন সুদূরপ্রসারী, এমন গভীর প্রেরণা এনে দেয় যে, এর প্রভাব হতে মুক্ত হবার চেষ্টামাত্রই অনেক ক্ষেত্রে হাস্যকর বলে প্রমাণিত হয়। এই প্রমাণ একবার প্রকট হয়েছিল ইংরেজী শিক্ষার আদিযুগে।

ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে সমাজ যখন বিপথগামী, ঠিক এমনই একটা যুগে আবির্ভূত হলেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তাঁর পারিবারিক ও সামাজিক জীবন তৎকালীন আর দশটা মধ্যবিত্ত পরিবারের মত ছিল। তবে বর্তমান মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষা ও সেকালের মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষা এক রকম ছিল না। সেকালে মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষা অনেকটা সংস্কার-ঐতিহ্যের প্রতি কুর্ণিশ করতে করতে বর্ধিত হয়েছিল। তাই সমাজের সব মানুষই ইংরেজী শিক্ষার মধ্যে মুক্তির স্বাদ পায় নি। এর মাঝে যে সংরক্ষণশীলতার ভাব ছিল তা জাতিকে অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করেছে সন্দেহ নেই। চিন্তার জগৎ, ভাবের জগতে ঊনবিংশ শতাব্দী যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তা অষ্টাদশ শতাব্দীর ভাবসাধনা হতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে নি। সম্ভবতঃ কবি ঈশ্বর গুপ্ত রামপ্রসাদ সেনের কাব্য পড়ে বুঝতে পেরেছেন যে, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ উভয়েই অতি ইন্দ্রিয় সাধনার স্বাদ পেয়েছিলেন। কিন্তু পাত্রভেদে এই দুই সাধনার রূপ ভিন্ন প্রকৃতির হয়েছে।

কবি ঈশ্বর গুপ্ত কিন্তু সাধনার ধারা হতে কাব্যের রস

গ্রহণ করেছেন। ইতিপূর্বে যে বস্তুকে নিছক বস্তু বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে—তা সমাজপ্রবাহপুষ্ট বস্তু। জীবনানুভূতির রহস্যময় স্তরে এর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। আমরা সাধারণতঃ কবি ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য সমালোচনায় সমাজচেতনার এই দিকটি বেশী করে দেখে থাকি। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত যেখানে সমাজ-চেতনার কবি সেখানেই ব্যঙ্গের ছন্দে আত্মপ্রকাশ করেছেন এবং নিজে সামাজিক জীবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সমাজের বিশেষ বিশেষ মনোভাবের উপর তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন। এই ব্যঙ্গ জ্বালাময় না হয়ে বরং ক্ষেত্র বিশেষে হাস্যরসের সঞ্চার করে :—

"কিছুমাত্র নাহি জানি রাম রাম হরি।
কারে বলে রেডিকেল কারে বলে টোরি॥
হুইগ কাহারে বলে কেবা তাহা জানে।
হুইগের অর্থ কভু শুনি নাই কানে॥
টোরি আর হুইগের যে হন প্রধান।
আমাদের পক্ষে ভাই সকল সমান॥"

এই হাস্যরসের অভ্যন্তরে যে উদাসীনতাপূর্ণ নিরপেক্ষ বিচার রয়েছে—তা কবিকে অনেক পরিমাণে রস পরিবেশনে সহায়তা করেছে—অন্যথায় এমন ভাষায় রসাত্মক কবিতা সৃষ্টি হত যা রসবিহীন নিছক তীব্র বিদ্রূপে প্রকাশ পেত। অবশ্য ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় যে বিদ্রূপের শাণিত ছুরি ঝলমল করে উঠে নি, এমন নয়। কিন্তু লঘু হাস্যরসের পরিবেশনই বেশী। বস্তুতঃ এ জীবনের একটা ভঙ্গী। সমাজ-জীবনে এর মূল্য আছে বটে, কিন্তু ব্যক্তির অন্তর-জগতে এই জাতীয় রসিকতার স্থান সংকীর্ণ। জীবন যেখানে সমাজের ভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সেখানে সামাজিক ভাবসমূহের বিচিত্র আলোচনা সম্ভব হতে

পারে। কিন্তু ব্যক্তি সব সময় নিছক ব্যক্তি নয়। তার অন্তর-জগৎ বহুকালের সংস্কার দ্বারা সুগঠিত। এই সংস্কারের জগতে মানবের মন যতই প্রবেশ করে ততই মানব মন আত্ম-চিন্তার অনুগামী হয়ে থাকে। জীবনের স্বরূপকে সমাজের মুকুরে প্রতিফলিত করে তার প্রতিবিম্ব আমরা প্রতিনিয়তই দেখে থাকি। তা কতটা বাস্তব তার বিচার করতে হলে জীবনের তথাকথিত ভাব অ-ভাব মনস্তত্ত্বের স্তর হতে মুক্ত হয়ে নৈর্ব্যক্তিক সাধনায় নিমগ্ন হতে হবে। সেখানে আক্ষেপ নেই, পরসত্তার মিলিত হবার আকূতি রয়েছে, সেখানে অভিমান নেই, আত্মসমর্পণের আনন্দ রয়েছে। এই যে পরম জগৎ-সত্তা, এতে মিলিত হবার আবেদন আপনা হতেই কাব্যে একদিন ফুটে ওঠে। তখন কবির জীবন যেন রূপান্তরিত হয়ে সত্যানুভূতি-রসে আপ্লুত হয়। এই সত্যানুভূতির জগতে মন দৈবতরূপে প্রকাশ হয়ে পড়ে।

"বুঝে শেষ সবিশেষ নিবেদন করি।
বিহিত বচন ধর মন মিশ মরি॥

* * *

জ্ঞানের স্থাপন কর মনের আধারে।
মর্ম বুঝে কর্ম কর ধর্ম অনুসারে॥"

এখানে যে ধর্মের উল্লেখ করা হয়েছে তা মূলতঃ নিষ্কাম ধর্মের কথা। যখন জ্ঞানকে মনের আধারে স্থাপন করার স্পৃহা অন্তরে জাগে তখন বুঝতে হবে, ধর্ম তথাকথিত লৌকিক আচার হতে ভিন্ন সত্তা লাভ করেছে এবং মানব মুক্তি সাধনার অঙ্গস্বরূপ প্রতিভাত হয়েছে। তাই "যে ভাবে যে ভাবে তাঁকে যে ভাবে সে পায়"। অবশ্য এটা সত্য যে, নিছক তত্ত্বচিন্তা কাব্য নয়। কাব্যের আধারে তত্ত্বের স্থান হতে পারে, কিন্তু আধার হতে

তত্ত্ব স্বপ্রধান হয়ে পড়লে তার মূল্য কাব্য হিসাবে কিছুই থাকে না। কাজেই কাব্যরস ও তত্ত্বরসে সব সময়ই সমন্বয় করে চলতে হবে। একে অন্যকে অতিক্রম করে চলতে পারবে না। কবি ঈশ্বর গুপ্ত এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তাই "কাল কন্যার সহিত বর্ষবরের বিবাহ" দিয়েছেন বটে, কিন্তু কাব্যের সুষমা ভোলেন নি।

"কালসুতা সর্বনাশী, সংহারিণী যেই।
বর্ষবরে বরমাল্য, দান করে সেই॥
ভগ্নকালে লগ্ন স্থির, মগ্ন সুখ ভোগ।
শুভক্ষণে শুভ কর্মে গণ্ডগোল যোগ॥"

এ কাব্য বুদ্ধিপ্রসূত হলেও কাব্যরসের অসদ্ভাব এতে নেই। বরং মহাকালের খণ্ড রূপকে সমাজ সমর্থিত এক বৈবাহিক সম্বন্ধের মধ্যে স্থাপন করে বর্ষকে বরের ভূমিকায় সাজিয়ে নবরসের সূচনা করেছেন। সমগ্র কবিতাটি বিবাহাদি কার্যে স্ত্রীআচারজনিত ভাব দ্বারা আবিষ্ট। অথচ মহাকালের গতির অনুভূতি, কবির নিমজ্জিত আত্মচেতনা এতে রয়েছে। কবির স্বভাবসুলভ রসিকতাও এতে স্থান পেয়েছে। কবি বর্ষকে বলেছেন :

"বিবাহ হইল শেষ, ওহে বর্ষবর।
মাচ্ নিয়া ঘরে গিয়া বউভাত কর॥
একা তুমি এসেছিলে চলে যেও একা।
দেখো যেন বোয়ে বরে নাহি হয় দেখা॥"

এর মধ্যে রসিকতা আছে, অনুভব করার মত রস আছে, আর তত্ত্বমূলক রসানুভূতি। কবি ঈশ্বর গুপ্তের সমগ্র রচনার পরিচয় এত স্বল্প পরিসরের মধ্যে দেখা সম্ভব নয়, তবু একটা সুর নির্ণয় করা সম্ভব। ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাস্রোতের

মধ্যে যে দ্বন্দ্ব মূর্ত হয়ে উঠেছে তা ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। সেই দিক হতে বিচার করলে দেখা যাবে যে, অধ্যাত্মচিন্তার সঙ্গে সমাজচিন্তার এক অপূর্ব সমন্বয় কবি ঈশ্বর গুপ্তে পরিণতি লাভ করেছে। তাই মনে হয় তিনি সমন্বয়ের কবি।

কবি-জীবনী

ঊনবিংশ শতাব্দীর এক দুর্যোগপূর্ণ কালে ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাব হয়েছিল। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজদৌলার পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে ইংরেজ শাসনের সূচনা হয়। বৃটিশ শাসনে দেশ একদিকে যেমন রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা হারায়, অন্যদিকে তেমনি তার পুরানো শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জীবনদর্শনও যায় আমূল বদলে। এই যুগসন্ধির কালে নূতন সামাজিক ও নৈতিক জীবনে দেশকে আত্মবিকাশের নেতৃত্ব দেন রাজা রামমোহন রায়, আর সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে নেতারূপে দেখা দেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

বাংলা সাহিত্যের যে প্রাচীন ধারা ১০ম শতাব্দী থেকে চলে এসেছে, ভারতচন্দ্রেই তার শেষ হয়। ঈশ্বর গুপ্ত থেকে সুরু হল নূতন ধারা। দেব-মাহাত্ম্য-প্লাবিত বাংলা সাহিত্যে তিনি প্রথম আনলেন দেশ-মাহাত্ম্য। আদিরসপ্রধান বাংলা সাহিত্যে রুচিসম্মত হাস্যরসের প্রবর্তনও তাঁর কৃতিত্ব। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, তিনি একদিকে যেমন ছিলেন সাহিত্য-স্রষ্টা, অন্যদিকে তেমনি ছিলেন ভাবী সাহিত্যের সংগঠক। তাঁর 'প্রভাকরে' বাল্যে হাত মক্স করেছিলেন যাঁরা তাঁদের একজন হলেন দীনবন্ধু মিত্র, আর একজন হলেন বঙ্কিমচন্দ্র। ঈশ্বর গুপ্ত যে প্রতিভা চিনতেন, তার এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে? এছাড়া ঈশ্বরগুপ্ত আর একটা বড় কাজ করেছিলেন—তাঁর অব্যবহিত পূর্ববর্তী কবিদের রচনা ও জীবন

বৃত্তান্ত সংগ্রহ করে তিনি প্রভাকরে প্রকাশ করেছিলেন, যার ফলে তা বিলুপ্তি থেকে রক্ষা পেয়েছে। মাত্র সাতচল্লিশ বছরের জীবনে এত কাজ করেছেন যিনি, তিনি কত বড় ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার অধিকারী, তা বলে বোঝানো নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু কাল ধর্মে মানুষ ঈশ্বরগুপ্তকে ভুলেছে এবং তাঁর জীবন ও রচনা আজ গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গুপ্ত কবি শুধু সাহিত্যিক ছিলেন না, তিনি সাংবাদিকও ছিলেন। বিদেশী শাসনে ও সভ্যতা-সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণের নিরন্ধ্র তমিস্রার চাপে বাঙ্গালী তথা ভারত তাঁর নিজস্ব সংস্কৃতি ও স্বাদেশিকতার কথা ভুলেছিল। এখন আবার গুপ্তকবির মত যুগপ্রবর্তক ব্যক্তিগণের স্মরণের মধ্যেই ভারতের নিজস্ব আত্মা ফিরে পাবার পন্থা নিহিত আছে। বিদেশী শাসনের প্রারম্ভ থেকে রাজা রামমোহন, স্বামী বিবেকানন্দ, সুরেন্দ্রনাথ, ঋষি অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি যে কয়জন মহামানব বহির্ভারতে ভারতীয় সংস্কৃতির পুণ্য কমণ্ডলু হতে অমৃত বিতরণ করে এসেছেন, সে কমণ্ডলু ভারতীয় সংস্কৃতির সুধারসে পরিপূর্ণ করে এসেছেন যুগে যুগে গুপ্তকবির মত দৈবী-প্রতিভাসম্পন্ন ঋষিগণ—তাঁদের অমৃত নিস্যন্দি লেখনী ও বাণীর দ্বারা।

আজ স্বাধীন দেশে বিদেশী শাসকের বিকৃত ইতিহাস সংশোধনের দিন এসেছে। মিশনারী সাহেবরা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে অন্যায় দাবী করে গেছেন যে, বাঙ্গালীর সাহিত্য তো দূরের কথা, ব্যবহারিক গদ্যও ছিল না। যা কিছু ছিল তা অশিক্ষিত জনগণের পাঁচালী বা ছড়া। তাঁরাই নাকি প্রথম বাংলা গদ্য প্রণয়ন করে শ্রীরামপুরে মুদ্রাযন্ত্রের দ্বারা প্রকাশিত করেন। এ অসত্যের অবসান ঘটিয়ে প্রকৃত সত্য উদ-

ঘাটনের দিন এসেছে। কারণ মিশনারীদের পূর্বে রামরাম বসু প্রথম বাংলা গদ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশ করেন। (এ বিষয়ে আমি গত ১১ই জানুয়ারী ১৯৫৯ সাল যুগান্তরে "রামরাম বসু দ্বিশত বার্ষিকী" প্রবন্ধে আলোচনা করেছি।) রামমোহন রায় ও ঈশ্বর গুপ্তের অতি সুললিত ব্যবহারিক গদ্যের প্রচলন ছিল।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে যখন ভাষা ও ভাবের বন্ধ্যাত্ব তার প্রাণগঙ্গার স্রোত-প্রবাহকে রুদ্ধ করেছে, সে দিনের রসপিপাসু বাঙ্গালীগণ বাংলার নিষ্প্রাণ সংস্কৃতির প্রতি বাধ্যতামূলক বৈমুখ্য অবলম্বন করে পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির প্রতি মুখ ঘুরিয়েছে—সেই দিনের সেই সন্ধিক্ষণে ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাব। বাংলাদেশের কথাশিল্পের এই তমসাবৃত পট-ভূমিকায় আকস্মিকভাবে ইঙ্গ-বঙ্গ কলেজ প্রাঙ্গণে শুনতে পেলাম কলেজীয় কবিতার গুঞ্জন, যে দিন মুখর কলকাকলীর রূপ পেল, সেদিন বাংলা সাহিত্যের দিবালোকিত প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে ঈশ্বর গুপ্ত বঙ্গ সংস্কৃতির পুনর্জীবন ব্রতের উদ্বোধনের সঙ্কল্প করলেন। ঈশ্বর গুপ্তের সারা জীবন-ব্যাপী সাধনায় এই ব্রতের সাড়ম্বর উদযাপন চলেছে। গদ্যে ও পদ্যে, গানে ও গাথায়, পড়ায় ও ছড়ায়, ব্যঙ্গে ও বিদ্রূপে তাঁর দীপ্ত শাণিত প্রতিভা সমগ্র বাংলা সাহিত্য রূপে ও রসে, ফলে ও ফুলে পল্লবিত করে তুলেছিল।

ঈশ্বর গুপ্ত দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। শিক্ষার জন্য ও শিক্ষামূলক পুস্তক রচনার জন্য (পূর্বে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি) একবার বেথুন সাহেব তাঁকে যে অনুরোধ করে পত্র লেখেন তা এখানে মূল পত্রটি উদ্ধৃত করলাম :—

7th July, 1851

Sir,

I receive many complaints from the conductors of female schools that there is no simple Bengali Poetry fit for their use. There is no doubt that much knowledge, both in the way of moral precept and of general description, can be given in verse, in a form which is both more attractive to children to learn, and more easy for them to remember, than in Prose.

I have heard from many persons that you are one of the best living writers of Bengali Poetry, and you could be more usefully employed in preparing a few poems for this express purpose. In England, many distinguished writers have not thought it befitting them to compile works for the use of the young. Indeed it is a far more difficult task than to write for those of full age, as will be readily acknowledged by any who have tried it, the object being to convey sound starting sense or else beautiful and poetical ideas in simple language, suited to the comprehension of the young minds—for whom they are intended. If you devote some time to this task, and succeed in producing such a book as is wanted, your countrymen will have much reason to be obliged to you and to their gratitude I shall readily add mine. If you call on me, I will show you some specimens of English poems written for children, which might

be of use to you. I need hardly remark on the necessity of excluding rigorously every loose or impare thought, or indecent word from such a collection. I mention this, however, because it is a fault from which I understand some of your most admired writers are not wholly free.*

Baboo, yr. siny.
Issurchander Goopto. S. D. W. Bethune

উল্লিখিত পত্র থেকে বোঝা যায় তখনকার দিনে ইংরেজ শিক্ষাবিদরা ঈশ্বর গুপ্তের প্রতিভাকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন বলে তাঁকে দিয়ে শিক্ষামূলক পুস্তক রচনার জন্য বেথুন সাহেব এই চিঠি পাঠিয়েছিলেন।

ঈশ্বর গুপ্ত খাঁটি বাংলা দেশের কবি। তাঁর জীবন ও কাব্য পড়লে বাংলা সমাজ ও সাহিত্য জীবনের মূল কেন্দ্রটি আমরা বুঝতে পারব। এই কেন্দ্র হতে আমরা বের হয়ে নানা ঘাত-প্রতিঘাতে বর্ত্তমানে বিচ্যুত হয়েছি বলে পুরানো ধারার সঙ্গে যোগসূত্র খুঁজে পাচ্ছি না, অথচ জাতীয় জীবনের ক্রমোন্নতির জন্য এই সূত্র খুঁজে বের করা বিশেষ প্রয়োজন।

ঈশ্বর গুপ্ত বিস্মৃত হওয়ার কারণ—মাইকেল মধুসূদন দত্ত। এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন:—

> "১৮৫৯।৬০ সাল বাঙ্গলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয়—উহা নূতন পুরাতনের সন্ধিস্থল। পুরাণ দলের শেষ কবি ঈশ্বরচন্দ্র অস্তমিত, নূতনের প্রথম কবি মধুসূদনের নবোদয়। ঈশ্বরচন্দ্র খাঁটি বাঙ্গালী, মধুসূদন ডাহা ইংরেজ।"

সেই ইংরেজীয়ানার যুগে "ডাহা ইংরেজের" নিকট "খাঁটি

* হিতপ্রভাকর হইতে সঙ্কলিত।

বাঙগালী" পরাস্ত হয়েছিলেন। তবে ১৮৬৬ সালে মধুসূদন "চতুর্দশপদী কবিতাবলী" পুস্তকে ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে যে প্রশস্তি কবিতা লেখেন তার সবটা এখানে উল্লেখ করলাম। এটাই মাইকেলের ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে একমাত্র রচনা:—

স্রোতঃ-পথে বহি যথা ভীষণ ঘোষণে
ক্ষণ কাল, অল্পায়ুঃ পয়োরাশি চলে
বরিষার জলাকারে; দৈব-বিড়ম্বনে
ঘটিল কি সেই দশা সুবঙ্গ-মঙগলে
তোমার কোবিদ বৈদ্য! এই ভাবি মনে হয়
নাহি কি হে কেহ তব বান্ধবের দলে,
তব চিতা-ভস্মরাশি কুড়ায়ে যতনে,
স্নেহ-শিল্পে গড়ি মঠ, রাখে তার তলে?
আছিলে রাখাল-রাজ কাব্য-ব্রজধামে
জীব তুমি; নানা খেলা খেলিলা হরষে;
যমুনা হয়েছ পার; তেঁই গোপগ্রামে
সবে কি ভুলিল তোমা? স্মরণ-নিমেষে,
মন্দ-স্বর্ণ-রেখা-সম এবে তব নামে
নাহি কি হে জ্যোতিঃ, ভাল স্বর্ণের পরশে?

মাইকেলের এই উক্তি হতে বোঝা যায় কত দরদ দিয়ে তিনি ঈশ্বর গুপ্তকে জেনেছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের উপরোক্ত উক্তি যেন কেমন খাপছাড়া মনে হয়। অবশ্য মাইকেল যদি কখনও ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে অবহেলা প্রকাশ করে থাকেন তবে তার নিশ্চয় একটা অন্তর্নিহিত কারণ আছে। অবশ্য এ মতটা আমার নিজস্ব মত—মাইকেল যে কোন কারণে হোক—হিন্দু-ধর্ম ত্যাগ করে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন এবং ইংরেজের আচার-ব্যবহার রীতিনীতি তাঁর দিন দিন খুব প্রিয় হয়ে উঠে। কোন

মানুষ যখন নিজের ধর্ম ত্যাগ করে, তার পূর্বে তাঁর মনে যে ক্ষোভ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় সেই ক্ষোভ-চঞ্চল অধ্যায় মানুষকে ধর্মচ্যুত করে। কাজেই তিনি ঈশ্বর গুপ্তকে ভাল চোখে দেখবেন কি করে—কারণ ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন গোঁড়া হিন্দু, আর মাইকেল হলেন গোঁড়া খৃষ্টান। সেই সময় ঈশ্বর গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকরের' পাতায় পাতায় ইংরেজের বিরুদ্ধে ক্রমাগত লিখে চলেছেন। ইংরেজদের সম্বন্ধে নানারূপ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কবিতা লিখে দেশবাসীর মনে দেশাত্মবোধ জাগাবার চেষ্টা করেছেন, কাজেই মাইকেল খৃস্টান হয়ে কি করে ঈশ্বর গুপ্তের প্রতিভার সুখ্যাতি করবেন। এ কাজ যে মাইকেলের পক্ষে সম্ভব নয় তা তৎকালীন পরিবেশ অনুযায়ী একটু চিন্তা করলে বুঝতে পারা যায়। তাই তিনি সামান্য কয়েক লাইন কবিতার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর গুপ্তকে যে সম্মান দিয়ে গেছেন তা যথেষ্ট বলতে হবে।

পূর্বেই বলেছি ঈশ্বর গুপ্ত সাংবাদিক ছিলেন। তাঁর পত্রিকাটির প্রথম পৃষ্ঠার উপরের দিকে দুইটি শ্লোক লেখা আছে। শ্লোক দুইটি সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ কর্তৃক রচিত। শ্লোক দুইটি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম :—

॥ মতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ॥
॥ উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসন্বাদনব প্রভাকরঃ ॥
॥ ০০০ ॥ নক্তং চন্দ্রকরেন ভিন্নকুলেম্বিন্দীবরেষু ক্কচিদভ্রাৎভ্রামমতন্দ্রমীষদ মৃতং
পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ ॥ ০০০ ॥
॥ ০০০ ॥ অদ্যোদ্যাদ্বিমল প্রভাকর করপ্রোদ্ভিন্ন পদ্যোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু
চতুরস্বান্তদ্বিরেফা রমং॥ ০০০ ॥

ঈশ্বর গুপ্তের আর একটি বড় গুণ ছিল তিনি ছাত্রদের উৎসাহ দিতেন। যুবশক্তিকে ঠিক পথে পরিচালনা করতে

পারলে দেশের অনেক উন্নতি হবে—এই ধারণা নিয়ে তিনি যুবকদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন এবং সাহিত্য ও শিক্ষা বিস্তারের জন্য তাদের সহযোগিতা কামনা করতেন। বর্তমানে প্রাচীন কবিওয়ালাদের গান ও কবিতা আমরা যে সকল পুস্তকে দেখতে পাই তার প্রায় পনেরো আনাই ঈশ্বর গুপ্তের সংগ্রহ। এই কাজে তিনি বহু অর্থ ও সময় ব্যয় করেছেন। এর জন্য তিনি বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেছেন। এই সম্পর্কে ঈশ্বর গুপ্ত ১৩ই জানুয়ারী ১৮৫৫ সালে (১লা মাঘ ১২৬১ সাল) 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রাচীন কবিদের সম্বন্ধে লেখেন:—

> "প্রাচীন কবি...আমরা বহুকালাবধি নিয়ত নিকর চেষ্টা ও প্রচুর প্রযত্নে প্রকর পরিশ্রম পুরঃসর এ পর্যন্ত যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার অধিকাংশ পত্রস্থ করিয়াছি, ক্রমে করিতেছি এবং ক্রমে ক্রমে আরো প্রকাশ করিব, কিছুই গোপন রাখিব না। যে উপায়ে হউক যত পাইব ততই মুদ্রিত করিব।"

গুপ্তকবি বাংলা সাহিত্যকে কি পরিণামসমৃদ্ধ করেছেন তা নিম্নের তালিকা হতে বুঝা যাবে। তিনি নিম্নলিখিত বই প্রকাশ করেন :—

(১) কালীকীর্তন, ইং ১৮৩৩। পৃঃ ২৭। এই পুস্তকখানি ঈশ্বর গুপ্তের প্রথম রচনা। (২) কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন বৃত্তান্ত। ইং ১৮৫৫। পৃঃ ৬১। (২) প্রবোধ প্রভাকর, ইং ১৮৫৮, পৃঃ ১২২। (৪) হিতপ্রভাকর, ইং ১৮৬১, পৃঃ ১৯২। (৫) মহাকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের বিরচিত কবিতাবলীর সার সংগ্রহ, ইং ১৮৬২। (৬) বোধেন্দুবিকাশ (নাটক), ইং ১৮৬৩, পৃঃ ১৪০। (৭) সত্যনারায়ণের ব্রতকথা। ইং ১৯১৩, পৃঃ ১২।

স্বাদেশিকতা, সাংবাদিকতা ও সাহিত্য রচনা ছাড়া ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে মানবিকতা ছিল প্রবল। মনুষ্যবোধ সম্পর্কে

তাঁর একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করলাম :—

"যে মনুষ্যের অর্থ দ্বারা ক্ষুধাতুরের ক্ষুধা এবং তৃষ্ণাতুরের তৃষ্ণা নিবারণ না হইল, সে মনুষ্য মনুষ্যই নহে; স্বজাতীয় ধর্মরক্ষার এবং বিদ্যার আলোচনার জন্য যে মনুষ্য যত্নশীল না হইল, সে মনুষ্য মনুষ্যই নহে; যে স্বদেশের স্বাধীনতা স্থাপনের প্রতি অনুরাগী ও উৎসাহী না হইল, সে মনুষ্য মনুষ্যই নহে।"...মনুষ্য তাঁহাকেও বলি, যিনি প্রেম-রূপে হেমদ্বারা মনের শরীর শোভিত করেন; মনুষ্য তাঁহাকেই বলি, দয়া যাঁর মনের অলঙ্কার হইয়াছে; মনুষ্য তাঁহাকেই বলি যিনি স্বদেশীয় লোকের কল্যাণার্থ অত্যন্ত অনুরাগী; অপিচ মনুষ্য তাহাকেই বলি, যিনি স্বজাতীয় ধর্ম ও শাস্ত্রের উন্নতির জন্য প্রযত্ন করেন এবং স্বদেশের স্বাধীনতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন।"*

কবি ঈশ্বর গুপ্তের জীবনী এই গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধে আলোচনা করেছি। এখানে শুধু একটি ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে কবি-জীবনীর প্রধান প্রধান ঘটনাসমৃদ্ধ একটি সংক্ষিপ্ত জীবনীর সন্নিবেশ করছি। গুপ্তকবির জীবনী প্রথম সংগ্রহ করেন সাহিত্যরসিক গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। গুপ্তকবির জীবনী আলোচনার তাই মৌল ভিত্তি।

কলকাতার ৩০ মাইল উত্তরে ভাগীরথীর পূর্বকূলে প্রসিদ্ধ কাঞ্চনপল্লী, অধুনা কাঁচড়াপাড়ায় বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন ১২১৮ সালে ২৫শে ফাল্গুন বাংলার পল্লীকবি ঈশ্বর-চন্দ্র গুপ্ত। তাঁর পিতার নাম ছিল হরিনারায়ণ গুপ্ত। গুপ্ত কবির বিদ্যাশিক্ষা বাল্যকালে কোন বিখ্যাত বিদ্যালয়ে হয়নি। গ্রামের পাঠশালায় তিনি প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন। প্রকৃতির দুলাল প্রকৃতির কোলে অবস্থান করে প্রকৃতিকেই ক্রমে শিক্ষার আশ্রয় করে গ্রহণ করেন। অতি বাল্যকাল থেকেই কবিতা

* সংবাদ প্রভাকর ১লা বৈশাখ ১২৫৫।

রচনায় তাঁর বিশেষ অনুরাগ দেখা যায়। আর এই অনুরাগবলে অগ্রসর হয়ে উত্তরজীবনে দিগন্ত ব্যাপিনী কীর্তি লাভ করেন। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কবিশক্তি তাঁকে এবিষয়ে সর্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য করেছিল। কথিত আছে যে, কবি যখন তাঁর মাতুলালয়ে বাস করেন তখন তাঁর বয়স পাঁচ ছয় বৎসর। তিনি তখনই কবিতা রচনা করেন।

কবির অতি অল্প বয়সেই তাঁর মাতৃবিয়োগ হয়। ফলে তিনি খুব মনোকষ্টে পড়েন। সংসারে অস্বচ্ছলতা দেখা দেয়। সেই সময় কলকাতার জোড়াসাঁকো অঞ্চলে কবি তাঁর মাতুলালয়ে চলে যান। সেখানে অবস্থান কালেই তিনি কিছু কিছু ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত হন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কবির কবি-প্রতিভার কমলটির এক-একটি দল মেলতে থাকে। যৌবনে তার রূপ প্রস্ফুটিত শতদলের সৌন্দর্য লাভ করে। কবির জীবনে এই সময় একটি দুর্লভ সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হয়। তৎকালীন জোড়াসাঁকো নিবাসী দেশহিতৈষী মহাত্মা যোগীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সম্প্রীতি স্থাপিত হয় এবং যোগীন্দ্রমোহন ঠাকুরেরই অর্থানুকূল্যে গুপ্তকবি সর্বপ্রথম প্রকাশ্য সাহিত্য জগতে আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ পান। ১২৩৭ সালের ১৬ই মাঘ থেকে ঈশ্বরচন্দ্র বাংলাদেশে প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা "সংবাদ প্রভাকর" প্রকাশ করেন। প্রথমে এই পত্রিকাটি সাপ্তাহিক হিসাবেই প্রকাশিত হয়, পরে ১২৪৬ সালের ৩০শে জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত 'প্রভাকর' সপ্তাহে তিনবার প্রকাশিত হয়। অবশেষে ১২৪৬ সালের ১লা আষাঢ় থেকে এই পত্রিকা প্রাত্যহিকে পরিণত। বাঙালীর দৈনিক সংবাদপত্রের চেহারা এই প্রথম প্রভাকরেই দেখা যায়। এই পত্রিকাটিতে কবি তাঁর সাহিত্য প্রতিভার চূড়ান্ত বিকাশ সাধন

করেছেন। এই সময় থেকেই তাঁর কবিত্ব কুসুমের সৌরভ চারদিকে বিকীর্ণ হতে লাগল। এই সাহিত্য-সাধনার বাহন করে কবি আর একটি মাসিক 'প্রভাকর' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এছাড়া "সাধুরঞ্জন" ও "পাষণ্ড পীড়ন" নামে আর দুখানি মাসিক পত্রিকারও তিনি প্রচলন করেছিলেন। 'পাষণ্ডপীড়নে'র জন্ম হয় ১২৫৩ সালের ৭ই আষাঢ়। এই সময়ে "ভাস্কর" সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের সঙ্গে গুপ্তকবির বিশেষ বিবাদ হয়। কবি 'ভাস্কর'-সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যকে নাম দেন 'গুড়গুড়ে ভটচাজ'। অবশ্য এই কলহ বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। কারণ 'পাষণ্ডপীড়ন' অল্পদিনেই আয়ু হারায়। কিন্তু উভয় পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা এত বেশী হয়েছিল যে সচরাচর তা দেখা যায় না। কবি তাঁর জীবিতকালে অনেক কবিতা ও গ্রন্থও রচনা করেছেন। "প্রবোধ প্রভাকর" "হিত প্রভাকর" "বোধেন্দু বিকাশ" প্রভৃতি এবং ভারতচন্দ্রের জীবন-চরিত এই গ্রন্থটিও রচনা করেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। গুপ্তকবি তাঁর রচনার ফাঁকে ফাঁকে দশ বার বৎসর দেশ ভ্রমণ করেছেন এবং দেশ ভ্রমণ করে তিনি এদেশের অনেক কবির জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহ করেন। আমাদের দেশে জীবন-চরিত লেখার প্রথা ছিল না। ঈশ্বর গুপ্ত অশেষ পরিশ্রম করে ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, রামনিধি, হরুঠাকুর, রাম বসু, নিতাই দাস প্রভৃতি কবির জীবনচরিত সংগ্রহ করেন। 'প্রভাকরে' এগুলি প্রকাশিত হয়। মহামতি বেথুন সাহেব কবিকে কয়েকটি শিশুপাঠ্য লেখার জন্য অনুরোধ করেন। কবিও সে অনুরোধ রক্ষা করেন। 'হিত প্রভাকর' এই অনুরোধেরই ফল। গুপ্তকবি বাল্যকাল থেকেই অনেক কবিয়ালের দলে গান গাইতেন, হাফ আখড়াই দলে উত্তর প্রত্যুত্তর বাঁধতেন। অনেক

গান বা পালা পাঁচালীওয়ালারা তাঁর নিকট থেকেই লিখিয়ে নিত। তিনি অনেক নতুন ছন্দের সৃষ্টি ও নামকরণ করেছেন। এই নামগুলি তাঁর স্বকপোলকল্পিত। তাঁর রচনার ভাষা অতি প্রাঞ্জল ও সুললিত ছিল। অনুপ্রাস ও যমক প্রভৃতি অলঙ্কার প্রয়োগে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর কবিতার প্রধান রস ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপ বা পরিহাস। হাস্যরসে ঈশ্বর গুপ্ত অনন্য-সাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর শিক্ষাদীক্ষা যথেষ্ট থাকলে তিনি আরো বহু কীর্তি রেখে যেতে পারতেন। কবির ভ্রাতা রামচন্দ্র গুপ্ত কবির কিছু কিছু রচনার প্রচার করেন কবির তিরোভাবের পর। কবি শ্রীমদ্ভাগবতের বঙ্গানুবাদ রচনা করতে আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু শেষ করতে পারেননি। কলি নাটক নামে একটি অভিনব নাটকও তিনি লিখতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তার পূর্বেই তাঁকে ইহধাম ত্যাগ করতে হয়। তাঁর রচনায় জ্বলন্ত দেশপ্রেম, স্বদেশ ও স্বজাতি প্রীতি, মানবপ্রেম ও সর্বোপরি ভগবৎ প্রেমের অপূর্ব প্রকাশ দেখা যায়। ঈশ্বরচন্দ্রের স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। কথিত আছে যে, তিনি এক দেড়মাসে 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ' মুখস্থ করে ফেলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের যখন ১৫ বৎসর বয়স, তখন তাঁর বিবাহ হয়। কিন্তু তিনি কোনদিন সংসারাশ্রমে আসক্ত ছিলেন না। ১২৩৭ সালে কার্তিক মাসে কবির পিতা হরিনারায়ণের মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর কবিকে বিশেষ অর্থকষ্টে পড়তে হয়েছিল। পরে এই দুঃখ বা অভাব দূর হয়। কবি দীর্ঘ-দিন নিরলসভাবে বঙ্গবাণীর সেবা করেছেন। তাঁর জীবনের একটি মহনীয় কীর্তি—তিনি সাহিত্যের কয়েকজন দিকপাল প্রতিভার সৃষ্টি বা বিকাশে সাহায্য করেছেন। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি

গুপ্তকবির সাকরেদ। এক সময়ে বঙ্গসাহিত্যের তিনিই ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও একচ্ছত্র সম্রাট। উত্তরজীবনে বাণী ও কমলার আশিসধারায় কবি হয়েছিলেন প্রয়াগতীর্থস্নাত। গুপ্তকবির সমগ্র রচনার অনেকাংশ জুড়ে আছে ব্যঙ্গরসাশ্রিত রচনা। এর প্রধান ভিত্তি হলো কবির ব্যক্তিজীবনের দুঃখকষ্ট ও অবিচার। কবির জীবন-চরিত তাঁর কাব্যের মতই মূল্যবান। কেননা কবিকে বুঝতে হলে জানতে হবে তাঁর জীবনকথা ও জীবন-চরিত। বঙ্গবাণীর এই মহান সেবী ১২৬৫ সালের ১০ই মাঘ মাত্র ৪৭ বৎসর বয়সে অকালে অমৃতলোকে প্রয়াণ করেন।